অদ্ভুতুড়ে সিরিজ

সোনার মেডেল

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

BENGALIEBOOK.COM
2021

সূচিপত্র

১. বিকেলের দিকে বাবু মিত্তির....................... 2
২. ছেলেটি এল পরদিন সকালে 14
৩. কালীপুরের সবচেয়ে বিখ্যাত জিনিস................ 28
৪. পায়রাটা এল.......................... 44
৫. কালীপ্রসাদ যে আজেবাজে..................... 61
৬. দুটি রাত প্রায় বিনিদ্র....................... 71

১. বিকেলের দিকে বাবু মিত্তির

বিকেলের দিকে বাবু মিত্তির চিঠিটা পেলেন। তাঁর দরোয়ান রাম পহলওয়ান এই সময়টায় রোজ তাঁকে এক গেলাস ঘোলের নোনতা শরবত খাওয়ায়। শরবতের সঙ্গে চিঠিটাও সে দিয়ে গিয়েছিল।

বাবু মিত্তির সব কাজই নিখুঁতভাবে করতে ভালবাসেন। সাবধানে ছোট কাঁচি দিয়ে খামের মুখটা কেটে চিঠিটা বের করলেন। দামি সাদা কাগজে টাইপ করা রোমান হরফে গীতার একটা শ্লোকের খণ্ডাংশ, “বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়-ডেল্টা।“

শরবতটা আর খাওয়া হল না। তিনি উঠলেন। বাবু মিত্তির আজকাল সব কাজই করেন খুব ধীর গতিতে। খেতে, পোশাক পরতে, চলাফেরা করতে তাঁর অনেকটা সময় লাগে। কেউ বিশ্বাসই করবে না যৌবনকালে এই বাবু মিত্তিরের চলাফেরা ছিল বাঘের মতো, বিদ্যুতের মতো, সাপের মতো। সাহেবরা তাঁর নামই দিয়েছিল কোব্রা।’

বক্সার বাবু মিত্তির অলিম্পিকে গিয়েছিলেন। লাইট হেভিওয়েটে সোনার মেডেলটা জেতার দুর্দমনীয় বাসনা ছিল। প্রথম তিন লড়াইতে প্রতিটিতে তাঁর প্রতিপক্ষ এক বা দুই রাউন্ডে নক আউট হয়ে যায়। চার নম্বর লড়াইয়ের আগে পেটের অসহ্য যন্ত্রণায় তিনি রিং-এ নামতে পারেননি। নামতে পারলে, ভারতের দীর্ঘদিনের একটা বদনাম ঘুচত।

কিন্তু পেটের ব্যথাটা কেন হয়েছিল সে বিষয়ে বাবু মিত্তির খুব নিশ্চিত নন। সাবোটাজ? ষড়যন্ত্র? এ ছাড়া আর কীই বা হবে? অলিম্পিক ভিলেজে ভারতীয় শিবিরে তাঁর তেমন শত্রু কি কেউ ছিল? বোধ হয় না। তবে এ-কথা ঠিক যে, ভাল ব্যবহারের জন্য বাবু মিত্তিরের মোটেই সুনাম ছিল না। রাগী, রগচটা, মারকুট্টা, স্পষ্টবক্তা, দুর্মুখ বাবু মিত্তিরকে কেউ পছন্দ করত না, সবাই এড়িয়ে চলত। কিন্তু তা বলে খাবারে গণ্ডগোল ঘটাবে এমন কেউ ছিল না। রহস্যটা আজও বাবু মিত্তিরের কাছে রহস্যই থেকে গেল। অলিম্পিক

ভিলেজে খেলোয়াড়দের খাবারদাবারের ব্যাপারে খুবই সতর্কতা থাকে। তবু কী করে যেন বাবু মিত্তিরের খাবারে মৃদু কোনও বিষ মেশানো হয়েছিল। কোন খাবারটিতে বিষটা ছিল, তা তিনি জানেন না, অনেক ভেবেছেন।

বাবু মিত্তির খুব ধীরে-ধীরে পোশাক পরলেন। আজকাল ধুতি আর কামিজ ছাড়া বিশেষ কোনও পোশাকই নেই তাঁর। পোশাক পরে পায়ে চটিটা গলিয়ে ধীরে-ধীরে দোতলা থেকে নেমে গ্যারাজ থেকে পুরনো অস্টিন গাড়িটা বের করলেন। গাড়ি আজও তিনি নিজেই চালান।

গাড়ি ছাড়বার আগে একবার নিজের বাড়িটার দিকে ফিরে চাইলেন তিনি। প্রকাণ্ড তিনতলা বাড়ি। অন্তত পনেরোটা শোওয়ার ঘর, দুটি বৈঠকখানা, একটা নাচঘর, দুটো ডাইনিং হল আছে। বাবু মিত্তির মারা গেলে এ বাড়ি বেওয়ারিশ হয়ে যাবে। তাঁর কোনও উত্তরাধিকারী নেই, থাকলেও যে কোথায় আছে তা তিনি জানেন না।

মরবার যে আর খুব বেশি দেরি নেই, তা বাবু মিত্তির জানেন। যে-চিঠিটা তিনি এইমাত্র পেলেন, সেটি ফাঁকা তাওয়াজ বা রসিকতা নয়।

যৌবনকালে বড়ই দুর্দান্ত মানুষ ছিলেন তিনি। প্রচণ্ড গুণ্ডামি করে বেড়াতেন। খুন না করলেও জখম করেছেন বিস্তর। সাহস ছিল, প্রচণ্ড রাগ ছিল। কিন্তু একটা গণ্ডগোলে পড়ে গিয়েছিলেন একবার। মুষ্টিযুদ্ধ ছেড়ে তখন তিনি সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু পৃথিবী-ভ্রমণের জন্য যথেষ্ট টাকা বা বিদেশি মুদ্রা তাঁর ছিল না। খুব কষ্ট করে এবং আইন ও আন্তজাতিক নিয়মকানুনকে ফাঁকি দিয়েও তিনি দেশে-দেশে ঘুরতেন।

আর্জেন্টিনায় সেবার একটা লোকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়ে যায়। বাবু মিত্তিরের চমৎকার পেটানো চেহারা, তেজ ও সাহস দেখে সেই লোকটা বলে, তোমাকে উপযুক্ত কাজ দিতে পারি। যথেষ্ট টাকা পাবে। কিন্তু খুব সাবধান, বেইমানি কোরো না।

অর্থাভাব এবং অনিশ্চয়তায় জেরবার বাবু মিত্তির লোকটার প্রস্তাবে রাজি হয়ে যান। সেই লোকটাই ছিল ডেল্টা নামে ছোট একটি টেররিস্ট সংগঠনের নায়ক। তবে তাদের কোনও বিশেষ মতাদর্শ ছিল না। টাকা পেলে তারা নেতা, ভি আই পি বা বাণিজ্যিক সংস্থার কর্ণধারদের খুন করত। সোনা, অস্ত্র, নেশার জিনিস চোরাপথে চালান দিত।

এই সংগঠনে বছরখানেক ছিলেন বাবু মিত্তির। ওই এক বছরে গোটা দক্ষিণ আমেরিকা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ চষে বেড়িয়েছেন ডেল্টার বিভিন্ন কাজে। প্রচুর টাকাও পেয়েছিলেন। কিন্তু মেক্সিকোর এক অভিজাত নৈশভোজের নাচের আসরে একজন ইউরোপিয়ান শিল্পপতিকে খুন করার চুক্তি কার্যকর করতে গিয়ে বাবু মিত্তিরের সঙ্গী রাউল নিরাপত্তারক্ষীদের গুলিতে মারা যায়, এবং বাবু মিত্তির পালান।

পালানোর একটা সুযোগ কিছুদিন যাবৎ খুঁজছিলেন তিনি। ডেল্টার হয়ে কয়েকটা খুনের ঘটনায় তাঁকে অংশ নিতে হয়েছে। সমাজবিরোধী আরও নানা পাপ কাজ করতে হচ্ছে। এ-জীবন ঠিক তাঁর পছন্দ হচ্ছে বা। তিনি ভেবেছিলেন, কলকাতায় চলে গেলে ডেল্টা আর কিছু করতে পারবে না। অত লম্বা হাত বা বড় সংগঠন তাদের নেই যে, ভারতবর্ষে ধাওয়া করবে।

প্রচুর বিদেশি টাকা নিয়ে প্রথম আফ্রিকায় আর তারপর সোজা কলকাতায় চলে আসেন তিনি। বিশ্বভ্রমণের সাধ তখন মিটে গেছে।

একটু বয়সও হচ্ছে। তিনি বিয়ে করে সংসারে মন দিলেন।

কিন্তু সংসারে মন দিলেও নিজের চড়া মেজাজ এবং উগ্র কথাবার্তার দরুন সংসারে খুব অশান্তি ছিল। একটি ছেলে হয়েছিল বাবু মিত্তিরের। তার নাম রেখেছিলেন সর্বকালের সেরা একজন মুষ্টিযোদ্ধার নামানুসারে, রকি মিত্র। ইচ্ছে ছিল ছেলেকে বক্সার বানাবেন। এমন বক্সার যে, একদিন বিশ্বচ্যাম্পিয়ান হবে।

কিন্তু বাবু মিত্তিরের সেই সাধ পূর্ণ হয়নি। খুব শিশুকাল থেকেই বক্সিং-এ তালিম দিতে গিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন, ছেলেটা তার মায়ের স্বভাব এবং চরিত্র পেয়েছে। রকির মা শান্ত, নিরীহ, গম্ভীর এবং একটু

জেদি। রকিও তাই। রকি গান গায়, ছবি আঁকে। বক্সিংও করে, তবে তেমন রোখ নিয়ে নয়।

দশ বারো বছর বয়সেই রকিকে তিনি কম্পিটিশনে নামাতেন। রকি কখনও জিতত, কখনও হেরে যেত। হারত অন্যমনস্কতার দরুন। খুব রেগে গিয়ে ছেলেকে বেদম মারতেন তিনি।

ঠিক যোনো বছর বয়সে রকির মা মারা যান। মায়ের শ্রাদ্ধ করার পরদিনই রকি বাড়ি থেকে চলে যায়। শুধু একটা চিঠি রেখে যায় বাবার নামে। চিঠিতে লেখা ছিল, "আমাকে খুঁজে লাভ নেই। আমি চিরতরে চলে যাচ্ছি।"

বাবু মিত্তির অবশ্য খুঁজতে কসুর করেননি। লাভ হয়নি তাতে।

ছেলে নিরুদ্দেশ, স্ত্রী মৃতা। বাবু মিত্তির যখন সম্পূর্ণ একা হয়ে গেলেন তখনই ধীরে-ধীরে তাঁর শরীরে নানা ব্যাধি এসে বাসা বাঁধে। বক্সারদের মাঝে-মাঝে যে রোগটা হয় সেই পারকিনসন্স ডিজিজও তাঁকে কিছুটা কাহিল করেছে। বারবার মাথায় প্রতিপক্ষের জোরালো ঘুসি লাগলে মস্তিষ্কের সূক্ষ্ম কোষ আর স্নায়ুর ক্ষতি হতেই পারে।

এখন সঙ্গী বলতে পহলওয়ান দরোয়ান, পরিচারক রাখাল, আর তাঁর একটি কুকুর। অবশ্য তাঁর কিছু ছাত্রও তাঁর কাছে রোজই আসে। তিনি আজও তাঁদের বক্সিংয়ের কলাকৌশল শেখান।

বাবু মিত্রের টাকার অভাব নেই। মেক্সিকো থেকে পালিয়ে এসেই তিনি একটা ইলেকট্রনিক্সের ব্যবসা করে প্রচুর বড়লোক হয়ে যান। কিছুদিন হল ফলাও ব্যবসাটা বিক্রি করে দিয়েছেন। আর পয়সা করে লাভ নেই। খাবে কে?

রকি নিরুদ্দেশ হওয়ার পর দশ বছর কেটেছে। সে কোনও চিঠি বা খবর দেয়নি। রকির মুখটাই তাঁর আর ভাল মনে নেই।

সাবধানে গাড়ি চালিয়ে তিনি তাঁর উকিল বন্ধু গজপতির বাড়িতে এসে হাজির হলেন। গজপতি এখনও কোর্ট থেকে ফেরেননি। ভৃত্য তাঁকে নিয়ে খাতির করে বাইরের ঘরে বসাল। বাবু মিত্তির খুবই অন্যমনস্ক হয়ে চুপ করে বসে রইলেন।

গজপতি ব্যস্ত উকিল। ফিরতে মাঝে-মাঝে রাত হয়ে যায়। কিন্তু সেজন্য বাবু মিত্তির ধৈর্যহারা হলেন না। বসেই রইলেন।

গজপতি এলেন সন্ধে সাতটারও পর। "আরে মিত্তির যে! কী খবর?" বাবু মিত্তির বিনা ভূমিকায় বললেন, "গজপতি, আমার কি উইল করা দরকার?"

গজপতি অবাক হয়ে বলেন, "উইল! হঠাৎ উইলের কথা কেন?"

"আমি হয়তো আর বেশিদিন বাঁচব না।"

"কেন, যমরাজা কি কোনও পেয়াদার হাতে নোটিস পাঠিয়েছে?"

একটুও না-হেসে বাবু মিত্তির বললেন, "পাঠিয়েছে।"

"তা হলে যমের বাড়ি যাওয়ার জন্য প্লেনের টিকিট কিনে ফেলেছ?"

"একরকম তাই।"

"বলি, কোনও রোগটোগ হয়েছে নাকি? টার্মিনাল ডিজিজ? ক্যানসার বা হার্ট?"

"না। ইনিয়ে-বিনিয়ে মরা আমার ভাগ্যে নেই। আমি মরব দুম করে।"

গজপতি বসলেন। তারপর মৃদু একটু হেসে বললেন, "খুলে বলো।"

বাবু মিত্তির খুলে বললেন না। বলে লাভও নেই। শুধু বললেন, "আমার আয়ু সত্যিই আর নেই। মরতে আপত্তিই বা কী? কার জন্য বাঁচব? শুধু বিষয়সম্পত্তি নিয়ে একটা উদ্বেগ আছে। আমি মরার পর এগুলো পাঁচ ভূতে লুটে খাবে।"

"তোমার বয়স তো পঞ্চান্নছাপ্পান্নর বেশি নয় হে মিত্তির। এখনই। মরবে কেন?"

"মরতে বয়স লাগে না। ওসব কথা থাক। আমি চাই আমার টাকা-পয়সা, বিষয়-আশয় আমার ছেলেটা এসে ভোগ করুক। কিন্তু সে বেঁচে আছে কি না তা জানি না, যদি বেঁচে থেকে থাকে তবে হয়তো দুঃখ কষ্টেই আছে। আমি চাই সম্পত্তিটার এমন একটা বন্দোবস্ত করে যেতে, যাতে সে কোনওদিন ফিরে এলে ভোগদখল করতে পারে।"

গজপতি সামান্য চিন্তিত হয়ে বলেন, "উইল করতে পারো। তবে

উইল না করলেও আইনত ছেলেই পাবে। যেটা সবচেয়ে বড় দরকার তা হল রকির খোঁজ।"

"অনেক খুঁজেছি।"

"পত্রিকায় একটা বিজ্ঞাপন দিতে পারো।"

বাবু মিত্তির একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, "কোনও পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে বাদ রাখিনি। নিরুদ্দেশ হওয়ার পর টানা এক বছর প্রায় প্রতি রবিবার সব কাগজে বিজ্ঞাপন বেরোত।"

"সেটা আমি জানি। তবু বলছি, এখন আবার বিজ্ঞাপন দাও। সে হয়তো এতদিনে অভিমান ভুলেছে। রাগও কমেছে। দেখই না দিয়ে।"

"তুমি যখন বলছ, দেব। কিন্তু ধরো, যদি হঠাৎ আজ কিংবা কাল–আমার মৃত্যু হয় তা হলে কী হবে?"

গজপতি অবাক হয়ে বলেন, "আজ বা কাল! কেন, মরার এত তাড়া কিসের হে? এত তাড়াহুড়োর তো কিছু নেই। দু-চারদিন সবুর করে তারপর না হয় মরবে।"

বাবু তাঁর পকেট থেকে চিঠিটা বের করে নিঃশব্দে গজপতির হাতে দিলেন।

গজপতি চিঠিটায় চোখ বুলিয়ে একটু ভ্রূ কুঁচকে বললেন, "এটার মানে কী? কিছু তো বুঝতে পারছি না।"

রোমান হরফে লেখা গীতার একটা শ্লোক।

"বাসাংসি জীনি যথা বিহায়-ডেল্টা! শ্লোকটার মানে তো জানি। মানুষ যেমন জীর্ণ বাস পরিত্যাগ করে...। তা বেশ তো, জীর্ণ বাস ত্যাগ করতে কেউ তোমাকে উপদেশ দিচ্ছে। কিন্তু সেই উপদেশ তুমি নিতে যাচ্ছ কেন?"

চিঠিটা ফেরত নিয়ে পকেটে ভরে বাবু মিত্তির বললেন, "তুমি চিঠিটার আসল অর্থ জানো না।"

"ডেল্টা কথাটার অর্থ কী?"

"ব-দ্বীপ।"

"সে তো বাচ্চা ছেলেও জানে। কিন্তু এখানে কী অর্থে প্রয়োগ হয়েছে? চিঠিটা দিলই বা কে?"

"সবটা তোমাকে বলা যাবে না। আমার একটা বিশ্রী অতীত আছে। খুব ভয়ঙ্কর সেই অতীত। ডেল্টা একটা আন্তর্জাতিক সংগঠন। আগে ছোট ছিল। এখন বিশাল আকার নিয়েছে।"

গজপতি হঠাৎ চিন্তিত মুখে বললেন, “ডেল্টা! ডেল্টা! দাঁড়াও, বোধ হয় ‘টাইম’ ম্যাগাজিনে একটা খবর পড়েছি, তাতে এ নামটা যেন ছিল!”

“ঠিকই ধরেছ, টাইম ম্যাগাজিন আমিও পড়ি। কিছুদিন আগে ডেল্টার গুপ্তঘাতকেরা নিউ ইয়র্কে একজনকে দিনে-দুপুরে মারে।”

গজপতি উদ্বেগের সঙ্গে বলেন, “এরাও কি তারাই?”

“তারাই। আমি একসময়ে ওদের মেম্বার ছিলাম। পালিয়ে এসেছিলাম। আজও ওরা প্রতিশোধের কথা ভোলেনি।”

গজপতি অবাক হয়ে বাবুর দিকে চেয়ে বলেন, “কিন্তু সংস্কৃত শ্লোক ওরা কোথায় পেল?”

বাবু মিত্তির মলিন একটু হাসলেন, “গীতা একটি আন্তজাতিক গ্রন্থ। সবাই খোঁজ রাখে। আমি ভারতীয় বলেই ওরা গীতা থেকে লাগসই একটা শ্লোকের কিছুটা তুলে দিয়েছে। অর্থ পরিষ্কার। আমাকে জীর্ণ বাসটি ত্যাগ করতে হবে। অর্থাৎ

“অর্থাৎ মৃত্যু?”

“এবার তোমার মাথা খেলছে।”

“ব্যাপারটা কি সত্যিই সিরিয়াস মিত্তির?”

“আমি ডেল্টাকে যতদূর চিনি, তাতে এই পরোয়ানাকে অমোঘ বলে ধরে নিতে পারো। আমাকে ওরা মারবেই। সেটা কবে বা কখন তার কিছু ঠিক নেই। আমার মনে হয়; ওরা দেরি করবে না। আমি একা মানুষ, অসুস্থ, নিজেকে রক্ষা করার মতো ক্ষমতা আমার নেই। ওদের কাজটা খুবই সহজ হবে।”

গজপতি একটু ভাবলেন। বাবু মিত্তির ধৈর্য হারিয়ে বললেন, "কী ভাবছ গজপতি? ভাববার সময় কিন্তু নেই।"

গজপতি বললেন, "না ভেবে পরামর্শ দেওয়া যায় নাকি?"

"তা হলে চটপট ভাবো। আমার যে সময় নেই।"

গজপতি ভ্রু কুঁচকে বললেন, "তোমার ওই চিঠিটাকে যদি সিরিয়াস বলে ধরেও নিই তা হলে অনুমান করতে পারি যে, ওরা তোমাকে খুন করতে বিদেশ থেকেই খুনি পাঠাবে। তাতে তো একটু সময় লাগার কথা। বিদেশ থেকে যে খুনটা করতে আসবে তাকে তো আগে এ-দেশের ঘাঁতঘোঁত জানতে হবে, নিজেকে বাঁচানোর ব্যবস্থা করে তবেই তো সে খুনটা করবে, নাকি?"

বাবু মিত্তির মাথা নেড়ে বললেন, "তা নয়। আগে এ-দেশে ওদের অর্গানাইজেশন ছিল না। আজকাল হয়েছে।"

"কী করে বুঝলে?"

"খুব সোজা। যেসব দেশে বহু ছেলে-ছোঁকরা বেকার বসে থাকে, যাদের ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই তারা রুজি-রোজগারের ধান্দায় যে-কোনও কাজে নামতে রাজি হয়ে যায়। আমি যখন ডেল্টায় ছিলাম তখন দেখেছি, অনুন্নত এবং গরিব দেশগুলোয় কত তাড়াতাড়ি অগানাইজেশনকে ছড়িয়ে দেওয়া যায়। আজকাল অপরাধও একটা ভাল জীবিকা।"

"তা হলে তুমি বলতে চাও ওরা এ-দেশেরই কাউকে এ কাজে লাগাবে?"

"সেটাই স্বাভাবিক।"

"তুমি কি জানো যে, ভারতবর্ষে ওদের অর্গানাইজেশন আছে?"

বাবু মিত্তির ম্লান হেসে বললেন, “তুমি ব্যস্ত উকিল, তাই বেশি খবর রাখো না। আমি কিন্তু বেকার মানুষ, হাতে অঢেল সময় বলে প্রচুর দেশি-বিদেশি ম্যাগাজিন পড়ি। ডেল্টা গত দু বছরে দিল্লি, বোম্বাই আর কলকাতায় ছড়িয়ে পড়েছে।”

এবার গজপতি খুবই উদ্বিগ্ন মুখে বাবুর দিকে চেয়ে থেকে বললেন, “তা হলে আপাতত তুমি বাড়িটা ছেড়ে কিছুদিন গা-ঢাকা দাও।”

বাবু মিত্তির মাথা নেড়ে বললেন, “লাভ নেই। ওদের যতদূর জানি এ চিঠি দেওয়ার আগে থেকেই ওরা আমাকে স্পট করেছে এবং নজরে রেখেছে। এই যে আমি তোমার কাছে এসেছি, ফেরার পথে হয়তো একটা মস্ত ট্রাক আমাকে গাড়িসমেত পিষে দিয়ে যাবে। কিংবা ডেল্টার লোক হয়তো আমার বাড়িতে কোনও অছিলায় ঢুকে আমার জলের কুঁজোয় সায়ানাইড মিশিয়ে দিয়ে যাবে। ইট উইল নট বি এ হিরোইক ডেথ ফর মি।”

গজপতি একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেন, “গুলিটুলি করবে না বলছ?”

“গুলিতে শব্দ হয়। খুনের প্রমাণ থাকে। ডেল্টা অত কাঁচা কাজ করে না। আজকাল তারা খুব স্কিলফুল কিলার হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাফিয়াদেরও পিছনে ফেলে দিচ্ছে। শোনো, আমার মৃত্যু নিয়ে দুশ্চিন্তা কোরো না। ওটা ঘটবেই। আমি শুধু বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে তোমার পরামর্শ চাই।”

গজপতি বিষণ্ণ মুখে বলেন, “বিষয়-সম্পত্তির বিলিব্যবস্থা করতেও তো একটু সময় চাই। তুমি যা বলছ, তাতে তো সময় একদম নেই। আচ্ছা, একটা কাজ করলে কেমন হয়?”

“কী কাজ?”

“কিছুদিনের জন্য যদি একজন বডিগার্ড রাখো?”

“কী লাভ? আমি যাকে বডিগার্ড রাখব তাকেও বিপদে ফেলে দেওয়া হবে। বাধা দিলে খুনি কি তাকেও ছাড়বে ভাবছ?”

"বডিগার্ডদের তো সেই ঝুঁকি নিতেই হবে। নইলে আর বডিগার্ড কিসের?"

"আমি কাউকে বিপন্ন করতে চাই না। বডিগার্ডের সাধ্যও নেই ডেল্টার খুনির হাত থেকে আমাকে রক্ষা করবে।"

গজপতি হতাশ গলায় বলেন, "তুমি চিরকালের গোঁয়ারগোবিন্দ, সবাই জানে। কিন্তু একটা কথা বুঝবার চেষ্টা করো। যদি ডেল্টার হুমকিটা সত্যিকারের হয় তা হলেও তোমার বিষয়-সম্পত্তির বিলিব্যবস্থার জন্য কিছু সময় দরকার। বডিগার্ড রাখলে হয়তো তোমার খুনি চট করে এগোবে না, একটু ভাববে। এবং নতুন ফন্দি আঁটবে। সেই ফাঁকে তুমি কিছু সময় পেয়েও যেতে পারো। আর একটা কথা হল, সবসময়েই এক জোড়ার চেয়ে দু জোড়া চোখ ভাল। তোমার গার্ড যদি একজন ইয়ংম্যান হয় তা হলে তার রিফ্লেক্স বা রি-অ্যাকশন তোমার চেয়েও অনেক বেশি ভাল হবে।"

বাবু মিত্তির কথাটা ভাবলেন। তাঁর নাম ছিল কোব্রা। সেই যৌবনের দিনে তাঁর চকিত রিফ্লেক্স, দুরন্ত গতি, দুর্দমনীয় শক্তি প্রতিপক্ষকে নাজেহাল করে দিত। আজ সেই বাবু মিত্তিরকেই কিনা বডিগার্ডের ওপর নির্ভর করতে হবে? বাবু মিত্তিরের শরীর বা মস্তিষ্ক সবই গেছে বটে, কিন্তু অহঙ্কারটুকু এখনও আছে। প্রস্তাবটা তাঁর অহঙ্কারে আঘাত করছিল।

সেটা অনুমান করেই বোধ হয় গজপতি খুব নরম গলায় বললেন, "বডিগার্ড থাকলে তোমার তো একজন সঙ্গীও হবে। সারাদিন তো বাড়িতে চুপচাপ বসে থাকো, একজন সঙ্গী থাকলে তো একা লাগবে না। একটু কথাবার্তা বলতে পারবে, মাথাটা হালকা হবে।"

বাবু মিত্তির গম্ভীর মুখে বললেন, "আমি একাই ভাল থাকি। তুমি তো জানোই, কথাবার্তা আমি পছন্দ করি না।"

"জানি। তুমি একটু অদ্ভুত লোক। কিন্তু পরিস্থিতি বিচার করে তোমার বডিগার্ড রাখতে রাজি হওয়া উচিত।"

বাবু মিত্তির ভ্রু কুঁচকে বললেন, "আচ্ছা, তুমি কোনও বেকার যুবককে এই ফাঁকে কিছু রোজগার করিয়ে দিতে চাইছ না তো! তোমার তো আবার পরোপকার করে বেড়ানোর অভ্যাস আছে।"

গজপতি খুব হাঃ হাঃ করে হাসলেন। তারপর বললেন, "অনুমানটা খুব ভুল হয়নি তোমার। আমার হাতে সত্যিই একটা ছেলে আছে। কিছুদিন মিলিটারিতে কাজ করে এসেছে। খুব সৎ ছেলে। খুব সাহসী আর বিশ্বাসী। দায়িত্বজ্ঞানও ভালই আছে। সবচেয়ে বড় কথা বাঙালির ছেলে হয়েও এ-ছেলেটি অ্যাডভেঞ্চার ভালবাসে।"

ভ্রূ কুঁচকে বাবু বললেন, "বেতন কত নেবে? বেশি হলে দরকার নেই।"

গজপতি মাথা নেড়ে বললেন, "তুমি বড্ড কেপ্পন লোক হে। যেখানে প্রাণ নিয়ে টানাটানি সেখানে পয়সা নিয়ে ভাবছ। তবে ভয়ের কারণ নেই। এ ছেলেটির পয়সার ভাবনা নেই। প্রাণগোপাল রায়ের নাম শুনেছ? হাওড়ায় বিরাট লোহার কারখানা। কোটিপতি মানুষ। পলাশ তারই ছোট ছেলে। সে তোমাকে পাহারা দেবে বিনা পারিশ্রমিকে। তার খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা রাখলেই হবে।"

বাবু মিত্তির উঠে পড়লেন। বললেন, "কাছারিঘরে বোধ হয় তোমার মক্কেলরা জুটতে শুরু করেছে। আমি আর তোমার সময় নষ্ট করব না, তোমার সুবিধেমতো ছেলেটাকে পাঠিয়ে দিয়ো। শুধু বলে দিয়ে যেন বেশি বকবক না করে।"

"তাই হবে। সে বেশি কথার মানুষ নয়। আর শোনো, তোমার ছেলের খোঁজে আমিই কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে দিচ্ছি। বিল তোমাকে পাঠিয়ে দেব।"

"লাভ আছে কিছু?"

"চেষ্টার ত্রুটি রাখতে নেই।"

২. ছেলেটি এল পরদিন সকালে

ছেলেটি এল পরদিন সকালে। বেশ লম্বা ছিপছিপে চেহারা। একটু যেন রোগাটেই। চোখে পড়ার মতো চেহারা নয় বটে, তবে চোখ দুটি বেশ উজ্জ্বল। গায়ে একটা ফর্সা সাদা ফুলহাতা শার্ট, পরনে নীল জিনস। পায়ে স্পোর্টস শু। নমস্কার করে বলল, “আমার নাম পলাশ রায়। গজপতিবাবু আমাকে পাঠিয়েছেন।”

বাবু মিত্তির খুব শান্ত হিসেবি চোখে ছেলেটিকে দেখে নিয়ে বললেন, “তুমিই সেই বডিগার্ড তো! বোসো।”

ছেলেটি বসবার পর বাবু মিত্তির বললেন, “তোমাকে বিপদের মধ্যে টেনে আনার কোনও ইচ্ছেই আমার ছিল না। তোমার বয়স অল্প, সামনে কত সম্ভাবনা। গজপতি চাপাচাপি করায় রাজি হতে হল। তুমি কি সব জেনেশুনে কাজটা করতে এসেছ?”

ছেলেটি খুব আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে হেসে বলল, “গজপতিবাবু আমাকে সবই বলেছেন।”

বাবু মিত্তির একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, “গজপতি হয়তো বিপদটা কীরকম তা আন্দাজ করতে পারছে না। নয়তো ভাবছে, চিঠিটা একটা রসিকতা।”

পলাশ ভুটা একটু কুঁচকে বলল, “বোধ হয় তা নয়। গজপতিবাবুকে খুব উদ্বিগ্নই মনে হল।”

বাবু মিত্তির পলকহীন চোখে পলাশের দিকে চেয়ে থেকে একটু ভাবলেন। তারপর বললেন, “চিঠিটা কোনও রসিকতা নয়। এটা মনে রেখো। “

“রাখব।”

“তুমি স্পোর্টসম্যান?”

“মিলিটারিতে থাকতে আমাকে প্রচুর ফিজিক্যাল ট্রেনিং করতে হয়েছে।”

“বক্সিং জানো?”

ছেলেটি হাসল, “না। তবে আপনি যে খুব বড় বক্সার ছিলেন তা জানি।”

“কুং ফু, ক্যারাটে, ওসব জানো নাকি?”

“না।”

বাবু মিত্তির মাথা নেড়ে বললেন, “জেনেও এক্ষেত্রে লাভ ছিল না। আমি অবশ্য কুং ফু, ক্যারাটে তেমন পছন্দও করি না। তোমার প্রিয় স্পোর্টস কী?”

“আমি ভাল দৌড়ই। এ ছাড়া মাউন্টেনিয়ারিং আর সাঁতার।” বা

বু মিত্তির একটু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন, “ওঃ, একশো মিটার কত সেকেন্ডে দৌড়তে পারো?”

“সাড়ে বারো সেকেন্ড বা তার একটু বেশি।”

বাবু মিত্তির সময়টাকে তত গুরুত্ব দিলেন না। বললেন, “আমাকে তোমার কিছু জিজ্ঞেস করার আছে কি?”

পলাশ খুব সঙ্কোচের সঙ্গে বলে, “একটা কথা জানতে চাই। চিঠি কোথা থেকে এসেছে?”

“কোথা থেকে! কেন গোয়েন্দাগিরি করবে নাকি? আতশ কাঁচটাচ দিয়ে সূত্র আবিষ্কার করতে চাও না তো! ওসব করে লাভ নেই। তবু দেখতে চাইলে দেখ। ওই টেবিলের ওপর একটা সাদা খাম পড়ে আছে। ওটাই। এদেশেই কোথাও ডাকে ফেলা হয়েছে।”

পলাশ উঠে গিয়ে খামটা উলটে-পালটে দেখে বলল, “সিলটা ভাল বোঝা যাচ্ছে না। তবে মনে হচ্ছে, বোম্বাই থেকে পোস্ট করা।”

“তা হবে। চিঠিটা তোমার কাছেই রাখতে পারো। ওটাতে আমার প্রয়োজন নেই। আর কিছু জানতে চাও?”

“আপনি বেশি কথা পছন্দ করেন না বলে জিজ্ঞেস করতে ভয় পাচ্ছি। একটা ব্যাপার জানতে চাই। ডেল্টার লিডার এখন কে?”

বাবু মিত্তির উদাসভাবে ঠোঁট উলটে বললেন, “কে জানে? আমি যখন ডেল্টার অপারেটর ছিলাম তখন সেটা ছিল ছোট একটা অর্গানাইজেশন। রিং-লিডার ছিল পল। সেটা তার আসল নাম ছিল কি কে জানে। তবে এসব অগানাইজেশনের রিং-লিডাররা বেশিদিন টিকতে পারে না। খুনটুন হয়ে যায়। আর একজন এসে হাল ধরে।”

“রিং-লিডার বদল হলে তারা এতদিন বাদে কি প্রতিশোধ নিতে চাইত?”

বাবু মিত্তির পলাশের দিকে চেয়ে চিন্তিতভাবে বললেন, “তা বটে। হয়তো পল এখনও আছে। আমি আর খোঁজ রাখি না। কিন্তু ওসব জেনে কী হবে বাবা? পল আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। সারা পৃথিবীতে তার হাজারটা অপারেটর কাজ করে যাচ্ছে। ডেল্টা এখন একটা ভয়জাগানো নাম। মাফিয়াদের চেয়ে কম ভয়ঙ্কর নয়। ডেল্টা যখন কাউকে টারগেট করে, তখন কারও সাধ্য নেই যে, রক্ষা করবে। এমনকি পুলিশ আর মিলিটারি দিয়ে ঘিরে রাখলেও লাভ হয় না। কেন জানো? ডেল্টা ওই সিকিউরিটির ভেতরেও নিজের লোক রেখে দেয়। ওই পুলিশ বা মিলিটারির মধ্যেই তাদের লোক থাকে। যখন তাও না থাকে তখন কী করে জানো? ওই সিকিউরিটি গার্ডদের মধ্যে কারও ছেলে বা মেয়েকে কিডন্যাপ করে নিয়ে যায় আর মেরে ফেলার ভয় দেখিয়ে লোকটাকে বাধ্য করে নিজের ইচ্ছেমতো কাজ করিয়ে নিতে। এই যে তুমি আমাকে পাহারা দিতে এসেছ, হতে পারে তুমিই ডেল্টার লোক।”

পলাশ হাসল, “না। আমি ডেল্টার লোক নই।” বাবু মিত্তির বিরক্ত চোখে চেয়ে থেকে বললেন, “নও বলছ? আজ হয়তো নও। কিন্তু ডেল্টা ইচ্ছে করলে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তোমাকে দিয়ে তাদের কাজ হাসিল করিয়ে নিতে পারে। প্রথম টোপ ফেলবে প্রচুর টাকা দিয়ে। তাতে কাজ না হলে তোমার সবচেয়ে দুর্বল জায়গাটাকে অ্যাটাক করবে। ধরো, তোমার প্রিয় একটি ভাই বা বোন বা ভাইঝি, ভাইপো, যাকেই হোক তুলে নিয়ে যাবে। তাকে বাঁচানোর জন্য তখন তুমি কি এই বুড়ো বাবু মিত্তিরের লাশ ফেলতে দ্বিধা করবে? অপরাধ জগতের ভেতরকার খবর যদি তোমার জানা থাকত তা হলে ভয়ে-ঘেন্নায় শিউরে উঠতে।”

পলাশ সত্যিই শিউরে উঠল। কেননা তার একটা ফুটফুটে তিন বছর বয়সী ভাইঝি আছে, যাকে সে প্রাণাধিক ভালবাসে। তার ছোট একটা স্কুল-পড়া বোন আছে, ভীষণ ভক্ত তার। ডেল্টা তাদের কিডন্যাপ করবে নাকি সত্যিই?

দুটি চোখ সরু করে পলাশের ভাবান্তর লক্ষ করছিলেন বাবু মিত্তির। এবার বললেন, “ভাল করে ভেবে দ্যাখো বাবা। তোমাকে সুখে থাকতে ভূতে কিলোচ্ছে না তো! এ কাজে সত্যিই বিপদ আছে। শুধু তোমার একার নয়। তোমার গোটা পরিবারের বিপদ। আরও একটা কথা জেনে রাখো, ডেল্টার অপারেটররা সবসময়ে যে বীরের মতো বন্দুক-পিস্তল নিয়ে আসবে তাও নয়। তাদের খুনের পদ্ধতি খুবই বাস্তববোধ সম্পন্ন। তারা প্রয়োজনে জলে বা খাবারে বিষ মিশিয়ে দিতে পারে, রাস্তায় অ্যাকসিডেন্ট ঘটাতে পারে, সাজানো আত্মহত্যা অ্যারেঞ্জ করতে পারে, আমার বিছানায় গোখরো সাপ বা মারাত্মক কাঁকড়াবিছে ছেড়ে দিয়ে যেতে পারে মৃত্যু যে কোনদিক দিয়ে আসবে তুমি তার আন্দাজই পাবে না।”

পলাশ চিন্তিত হয়ে পড়ল। তার মুখ দেখে বাবু মিত্তির একটু হাসলেন। বললেন, “বুঝেছ তো ব্যাপারটা?”

পলাশ বলল, “তার মানে কি আপনাকে ডেল্টার হাত থেকে রক্ষা করার কোনও উপায়ই নেই?”

বাবু মিত্তির মাথা নেড়ে বললেন, “না। গজপতি অবশ্য মাত্র কয়েকটা দিন আমাকে বেঁচে থাকতে বলেছে, যাতে আমার বিষয়-সম্পত্তির বিলি-ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়। হয়তো একটা বা দুটো অ্যাটেম্পট থেকে আত্মরক্ষা করতে পারলে তিন-চারদিন সময় পাওয়া যাবে। কিন্তু ডেল্টা তার বেশি সময় আমাকে দেবে না। একটা-দুটো অ্যাটেম্পট কার্যকর না হলে ওরা আমাকে বোম মেরে উড়িয়ে দেবে, কোনও ল্যাটা রাখবে না।”

পলাশ চিন্তিত মুখে বলল, “কবে থেকে খুনের চেষ্টা করবে বলে আপনার মনে হয়?”

ক্লান্ত গলায় বাবু মিত্তির বললেন, “ওদের মোডাস অপারেন্ডি যতদূর জানি, ওরা সবরকম খোঁজখবর নিয়ে কাজে হাত দেয় না। চিঠিটা এসেছে গতকাল। চিঠি দেওয়ার আগেই ওদের তথ্য সংগ্রহের কাজ শেষ হয়েছে। আমি কী খাই, কখন খাই, কখন বেরোই, কোন যানবাহন ব্যবহার করি, আমার সঙ্গে কে থাকে, বাইরের কোন-কোন লোক নিয়মিত আমার বাড়িতে যাতায়াত করে, এইসব। আমার স্বভাব, চরিত্র, অভ্যাস, বাতিক, শখ, অসুখ, আমার ডাক্তার, রজক, পরামানিক, খবরের কাগজওয়ালা, দুধওলা, কাজের লোক, আমার পোষা পশুপাখি, আত্মীয়, বন্ধু, সব খবর ওরা নিয়ে ফেলেছে। মনে হচ্ছে, আজকেই কোনও সময়ে ওরা প্রথম আক্রমণটা করবে। আমি যখন ডেল্টার অপারেটর ছিলাম তখন আমাকেও এসব হোমওয়ার্ক করতে হত। ডেল্টা কোনও বেইমান বা বিশ্বাসঘাতক বা তাদের বিচারে কোনও ঘৃণিত লোককে মারবার আগে তার কোনও প্রিয়জন, তার ছেলে বা মেয়ে বা স্ত্রী–এদের কাউকে মারে। লোকটাকে প্রচণ্ড মানসিক কষ্ট দিয়ে তারপর তাকে খুন করে। ভাগ্যের কথা, আমার আজ সেরকম কেউ নেই। রকি নিরুদ্দেশ না হলে ডেল্টা আগে তাকেই মারত।”

পলাশ বলে, “আপনার ছেলেকে ডেল্টা কিডন্যাপ করেনি তো!”

বাবু মিত্তির মাথা নাড়েন, "না। কিডন্যাপ করলে তারা সেটা আমাকে জানিয়ে দিত। তাদের সব কাজের পেছনেই উদ্দেশ্য থাকে। রকি আমাকে পছন্দ করত না বলেই মায়ের মৃত্যুর পর চলে যায়। তোমার আর কিছু জানবার আছে কি? না থাকলে আমি একটু নীচের তলার জিমনাসিয়ামে যাব। আমার দু'জন ছাত্র ট্রেনিং করতে আসবে।"

পলাশ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "ঠিক আছে। তবে আমি আগে জিমনাসিয়ামটা একটু চেক করব।"

বাবু মিত্তির হাসলেন, "স্বচ্ছন্দে।"

পলাশ চলে যাওয়ার পর তিনি রাখালকে ডাকলেন। রাখালের বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ হবে। মেদিনীপুরের একটি গাঁয়ে তার বাড়ি। প্রায় সাত-আট বছর বাবু মিত্তিরের কাছে আছে। খুব বিশ্বাসী লোক। তবে বিশ্বাসীকে আজ আর বিশ্বাস নেই বাবু মিত্তিরের। ডেল্টা যে কাউকে কিনে নিতে পারে বা অন্যভাবে নিজেদের কাজ করিয়ে নিতে বাধ্য করতে পারে।

বাবু মিত্তির ভাল করে রাখালের মুখোনা দেখে নিলেন। কোনও পরিবর্তন ঘটলে চোখে তা ধরা যাবে। কিন্তু রাখালের চোখ আজ সকাল অবধি স্বাভাবিক। বাবু জিজ্ঞেস করলেন, "টাইগার কোথায়?"

"আজ্ঞে, বাঁধা আছে।"

"ওকে আমার কাছে নিয়ে আয়।" রাখাল গিয়ে টাইগারকে ছেড়ে দিতেই সে একটা উল্লাসের শব্দ করে কয়েক লাফে দোতলায় উঠে সোজা বাবু মিত্তিরের কাছে চলে এল।

বিশাল এই অ্যালসেশিয়ানটাই শুধু আজ বাবুর সবচেয়ে বিশ্বাসের পাত্র। ডেল্টা কিছুতেই একে বাবু মিত্তিরের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারবে না। কিন্তু ডেল্টা আর একটা কাজ করবে। বাবুকে মারার আগে টাইগারকে মারবে। কারণ, টাইগারই বাবুর সবচেয়ে প্রিয়পাত্র।

বাবু টাইগারের মাথাটা বুকের কাছে চেপে ধরে একটু আদর করলেন। বেশিই আদর করলেন। অবোলা জীব। বিনা দোষে ওকে মরতে হবে। ওকে বাঁচানোর এক শেষ চেষ্টা অবশ্য বাবু মিত্তির করবেন।

টাইগারের মাথাটা বুকে চেপে রেখেই তিনি টেলিফোন তুলে বোম টিপে একটা নম্বর ডায়াল করলেন। কেনেল হাভেন-এর রায় কুকুর নিয়ে ব্যবসা করে বটে, কিন্তু ওর কাছে কুকুরের যত্নের অভাব হয় না। রায়ের কাছ থেকেই টাইগারকে বছর-পাঁচেক আগে কিনে এনেছিলেন তিনি।

"রায় নাকি? আমার একটা উপকার করবে রায়?"

"আরে, মিস্টার মিত্তির, আমি তো সবসময়েই অ্যাট ইওর সার্ভিস। বলুন কী করতে পারি।"

"তোমার কাছে টাইগারকে কিছুদিন রাখবে?"

"কেন, বাইরে যাচ্ছেন কোথাও?"

"হ্যাঁ, তা বলতে পারো।"

"ঠিক আছে, পাঠিয়ে দিন।"

"না, পাঠানোর উপায় নেই। অসুবিধে আছে। ওকে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা তোমাকে করতে হবে। টাকা যা লাগে দেব।"

"ঠিক আছে, আমার ডগ-ভ্যান তো আছেই। পাঠিয়ে দেব।"

"শোনো রায়, আমার একটু তাড়া আছে। ভ্যানটা তুমি এখনই। পাঠিয়ে দাও।"

"বেশ তো, আধ ঘণ্টার মধ্যেই যাবে।"

"তোমার ওখানে এখন ক'টা অ্যালসেশিয়ান আছে রায়?"

"সব মিলিয়ে পনেরো-ষোলোটা হবে। কেন?"

"এমনিই। আমি অপেক্ষা করছি কিন্তু।"

ফোন ছেড়ে বাবু একটু নিশ্চিন্ত বোধ করলেন। রায়ের কাছে পনেরো-ষোলোটা অ্যালসেশিয়ান আছে, টাইগার ওদের মধ্যে থাকলে ওকে আলাদা করে চেনা যাবে না। হয়তো টাইগার বেঁচে যাবে।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই ডগ-ভ্যান চলে এল! বাবু মিত্তির ভাল করে দেখে নিলেন ভ্যানটা সন্দেহজনক কি না। ড্রাইভারকেও দু-একটা প্রশ্ন করলেন। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে টাইগারকে ভ্যানে তুলে ভেতরে হুকের সঙ্গে শিকলটা আটকে দিয়ে নেমে পড়লেন। টাইগার প্রচণ্ড চেঁচাল। বাবু মিত্তির কানে হাত চাপা দিলেন। তাঁর চোখ জলে ভরে এল।

কিছুক্ষণ বাদে রায়কে আবার ফোন করলেন। রায় বলল, "চিন্তা করবেন না, আপনার টাইগার পৌঁছে গেছে। অনেক সঙ্গী-সাথী পেয়ে আনন্দেই আছে। আপনি নিশ্চিন্তে বাইরে থেকে ঘুরে আসুন।"

জিমনাশিয়ামে তাঁর তিন-চারজন ছাত্র অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছে।

এরা এশিয়াডের ট্রায়ালে যাবে। ঘষামাজা করতে বাবু মিত্তিরের কাছে আসে।

বাবু মিত্তিরের অবশ্য আজ কোচিংয়ে মন নেই। মনটা বড্ড খারাপ। তবু জিমনাসিয়ামে এলেন। ছেলেদের কিছুক্ষণ মৌখিক তালিম দিলেন।

ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলতে বলতেই লক্ষ করলেন, জিমনাসিয়ামের র‍্যাকে রাখা তাঁর গ্লাভসগুলো খুব খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছে পলাশ। ছোকা সাবধানী আছে। গ্লাভসের ভেতরে কিছু একটা ঢুকিয়ে রাখা সোজা ব্যাপার।

কিছুক্ষণ ছেলেদের প্র্যাকটিস করালেন বাবু মিত্তির, কয়েকটা প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে ওপরে উঠে আসবার সময় শুনতে পেলেন, ওপরের বসবার ঘরে ফোন বাজছে।

ফোন তুলে হ্যালো বলতেই রায়ের গলা পাওয়া গেল, "মিস্টার মিত্তির, কেনেল হাভেন থেকে রায় বলছি। আচ্ছা, আজ সকালে টাইগারকে কী খাওয়ানো হয়েছিল বলুন তো?"

বাবু মিত্তিরের মজবুত হৃৎপিণ্ড হঠাৎ প্রবলভাবে ধকধক করতে থাকে। সামান্য কাঁপা গলায় তিনি বললেন, "কেন, কী হয়েছে?"

"খুব স্যাড কেস। এখানে আসার ঘণ্টাখানেক বাদেই টাইগার অসুস্থ হয়ে পড়ে। এ ক্লিয়ার কেস অব ফুড পয়জনিং।"

"তোমাদের ওখানে কিছু খায়নি তো!"

"না মিস্টার মিত্তির। আমরা কুকুরকে একবার খাওয়াই, বেলা দুটোয়।"

বাবু মিত্তির বাঁ হাতে নিজের বুকের বাঁ দিকটা চেপে ধরে বললেন, "টাইগার কি বেঁচে আছে?"

"আধ ঘণ্টা আগে এক্সপায়ার করেছে। আমি অত্যন্ত দুঃখিত, কিন্তু দোষটা অবশ্যই আমাদের নয়। বিশ্বাস করুন।"

বাবু মিত্তিরের মাথাটা শূন্য লাগছিল। চারদিকটা বড় ফাঁকা। ধীরে রিসিভারটা রেখে দিলেন তিনি, চোখ দিয়ে অবিরল ধারায় জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

পলাশ নিঃশব্দে সামনে এসে দাঁড়াল। কিন্তু কোনও কথা বলল না। চুপচাপ অপেক্ষা করতে লাগল।

বাবু মিত্তির চোখ মুছলেন। বড় ক্লান্ত, বড় হতাশ, বড় শূন্য লাগে তাঁর। শরীরের সব শক্তি যেন কেউ সিরিঞ্জ দিয়ে টেনে বের করে নিয়েছে। ইজিচেয়ারে শরীরটা এলিয়ে দিয়ে পলাশের দিকে মড়ার মতো চেয়ে থেকে বললেন, "ডেল্টা স্ট্রাইকস।"

পলাশ স্থির দৃষ্টিতে বাবু মিত্তিরের দিকে চেয়ে থেকে বলে, "কখন?"

"আধ ঘণ্টা আগে।"

পলাশ সোজা গিয়ে রাখালকে ধরল, "সকালে টাইগারকে কী খাইয়েছ রাখাল?"

রাখাল একটু অবাক হয়ে বলে, "রোজ যা খায়। দুধ আর ভিটামিন ক্যাপসুল।"

"ক্যাপসুল! কই শিশিটা দেখি!"

রাখাল শিশিটা এনে দিয়ে বলে, "কেন, কী হয়েছে?"

"টাইগার মারা গেছে।"

রাখালের মুখটা ফ্যাকাসে, বিহ্বল হয়ে গেল, "মারা গেছে! টাইগার!"

"বিষক্রিয়া। এ-শিশিটা কোথায় থাকে?"

রাখালের ঠোঁট কাঁপল, তারপর মুখে হাত চাপা দিয়ে কেঁদে উঠল। জবাব দিতে পারল না।

পলাশ বুঝল, এই পরিস্থিতিতে তার গোয়েন্দাগিরির কাজ এগোবে না। বোধ হয় লাভও নেই। তার ঘোরতর সন্দেহ, বিষটা ছিল ক্যাপসুলের মধ্যে। একটু বিলম্বিত ক্রিয়ার ক্যাপসুলই হবে, যা পেটে গিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে গলে যায় না। একটু সময় নেয়। কিন্তু এ-তথ্য জেনেই বা লাভ কী? ডেল্টা তার উপস্থিতি তত ভালরকমেই জানান দিয়েছে।

পলাশ আবার বাবু মিত্তিরের কাছে ফিরে এল। সে যথেষ্ট ঘাবড়ে গেছে। বুদ্ধি স্থির রাখতে পারছে না।

বাবু মিত্তির কিন্তু ইতিমধ্যে সামলে গেছেন। চোখ-মুখ গম্ভীর বটে, কিন্তু অসহায় ভাবটা নেই। পলাশের দিকে চেয়ে বললেন, "কিছু বুঝলে?"

"ভিটামিন ক্যাপসুলের শিশিটা কেউ বদল করে দিয়ে গেছে। বিষ ছিল ক্যাপসুলের মধ্যেই।"

বাবু মিত্তির একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "তা হলে তো রাখালকে সন্দেহ করতে হয়। কিন্তু আমি ওকে যতদূর লক্ষ করেছি, ডেল্টা এখনও ওকে হাত করেনি।"

"তা হলে?"

বাবু মিত্তির হাসলেন, "বিষটা দুধের মধ্যেও থাকতে পারে। দুধটা বাইরে থেকে আসে।"

পলাশ একটু স্তব্ধ হয়ে থেকে সপ্রতিভ মুখে বলল, "তা বটে। কিন্তু দুধে বিষ থাকলে টাইগার তো তখনই মারা যেত।"

বিষ হাজারো রকমের হয়। যাকগে, লক্ষণ যা দেখছি, গজপতিকে আর সময় দিতে পারব না। ডেল্টা আমার ঘাড়ে নিশ্বাস ফেলছে। শুধু ছোবলটা দেওয়া বাকি।"

"আমাদের কি কিছুই করার নেই কাকাবাবু?"

"আছে। রাখালকে গিয়ে বলল, দুধওয়ালা যে দুধটা দিয়ে গেছে সেটা যেন ফেলে দেয়। কাককুকুরেও যেন মুখ দিতে না পারে।"

পলাশ দৌড়ে গিয়ে রাখালকে কথাটা বলে এল। তারপর বলল, "আর কিছু কাকাবাবু?"

“আর কিছু মাথায় আসছে না। তবে ওভারহেড ট্যাঙ্কের জলটা আজ ব্যবহার না করাই ভাল। ডেল্টা বিষে বিষক্ষয়ের চেষ্টা করছে বলে মনে হয়। জলে বিষ মেশানো কঠিন কাজ নয়। আজ যেন সবাই টিউবওয়েলের জল ব্যবহার করে। দরোয়ান রাম পহলওয়ানকে বোলো, কাউকে যেন বাড়িতে ঢুকতে না দেয় আমার হুকুম ছাড়া।”

পলাশ এসব জরুরি কাজ করতে চলে গেলে বাবু মিত্তির উঠলেন। একটা ছোট চিরকুট লিখে একটা কৌটোয় ভরলেন। তারপর নিঃশব্দে ছাদে উঠে এলেন। চিলেকোঠার গায়ে পায়রার জন্য খোপ করা আছে। অনেকগুলো খোপের মধ্যে বিশেষ একটি খোপ থেকে তিনি একটি পায়রাকে বের করে আনলেন। পোষা, বাধ্য পায়রা। তার পায়ে কৌটোটা সাবধানে বেঁধে বাবু মিত্তির আকাশে উড়িয়ে দিলেন। পায়রাটা একবার একটা চক্কর খেল আকাশে। তারপর সোজা দক্ষিণ-পুব দিকে সুনির্দিষ্ট একটা রেখায় উড়ে যেতে লাগল।

বাবু মিত্তির একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। কালীপ্রসাদের সঙ্গে তাঁর আজও এইভাবেই যোগাযোগ হয়। সহজ এবং নিশ্চিত যোগাযোগ। কালীপ্রসাদই পায়রাটা দিয়েছিল তাঁকে।

বাবু মিত্তির দোতলায় নেমে এসে শোওয়ার ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। জানলাগুলো আগে থেকেই বন্ধ এবং ভারী পরদা টানা। ঘর একরকম অন্ধকার, বাবু মিত্তির বালিশের পাশ থেকে টর্চটা তুলে নিয়ে দেওয়ালের গায়ে তাঁর বিশাল ওয়ার্ডরোবটা খুললেন, ভেতরে বিস্তর স্যুট, প্যান্ট, শার্ট, টাই ঝুলছে। একসময়ে এসব পোশাক ব্যবহার করতেন। এখন পড়েই থাকে। ওয়ার্ডরোবের বাঁ ধারে একটা সুইচ টিপে ধরলেন বাবু মিত্তির। টুক করে একটা ইলেকট্রনিক লক খুলে গেল। ছোট একটা ঢাকনা পট করে ঝুলে পড়ল। ভেতরে একটা নম্বর-লেখা চৌকো বোর্ড। অভ্যস্ত আঙুলে মুখস্থ কয়েকটা নম্বর ছুঁতেই মৃদু আর-একটা শব্দ হল। বাবু মিত্তির বাঁ দিকের সাইড প্যানেলের গায়ে লাগানো একটা ছোট আংটা ধরে টান দিতেই গোপন একটি খোপ উন্মোচিত হল। তিনি খোপের ভেতরে হাত দিয়ে একটা পুরনো হার্ড টপ মাঝারি মাপের সুটকেস বের করলেন।

কম্বিনেশন লক খুলে ডালাটা তুলতেই দেখা গেল, ওপরে একটা সবুজ তোয়ালের ওপর একটি নয় মিলিমিটার বোরের পিস্তল শুয়ে আছে। ব্যারেল কিছুটা ভোঁতা, হাতলের ভেতরে এগারো গুলির ম্যাগাজিন পোরা আছে। বেশ ভারী ও বিপজ্জনক অস্ত্রটি সস্নেহে তুলে নিলেন তিনি। তোয়ালে সরিয়ে একবার দেখলেন, মেক্সিকো থেকে আনা তাঁর বিপুল নগদ ডলারের রাশি। যা এনেছিলেন তার বেশির ভাগই খরচ হয়েছে কারখানা করতে গিয়ে। কিন্তু এখনও লাখ কুড়ি ডলার তাঁর আছে। শুধু এই সুটকেসেই আছে লাখচারেক ডলার।

পিস্তলটা বের করে সুটকেস যথাস্থানে রেখে ওয়ার্ডরোব বন্ধ করে দিলেন বাবু মিত্তির। পিস্তলটার কোনও লাইসেন্স নেই। এটা তিনি চোরাই পথে এনেছেন। ডেল্টার সঙ্গে তাঁর শেষ অ্যাসাইনমেন্টে এটাই ছিল তাঁর অস্ত্র। রাউল আক্রান্ত হলে তাকে বাঁচানোর জন্য বাবু মিত্তির একটিও গুলি চালাননি সিকিউরিটি গার্ডদের লক্ষ্য করে। চালালে লাভও হত না। একজন বা দুজনকে মারতে পারতেন, কিন্তু তাদের গুলিতে নিজে ঝাঁঝরা হয়ে যেতেন। গুলি চালাননি বলে ধরাও পড়েননি। নিরাপদে পালাতে পেরেছিলেন। তাতে তেমন দোষ হয়নি তাঁর, পরিস্থিতি বুঝে ঠিক কাজই করেছিলেন। কিন্তু নিয়মানুসারে তাঁর উচিত ছিল ডেল্টার হেডকোয়ার্টারে গিয়ে ঘটনাটা রিপোর্ট করা।

পিস্তলটার দিকে চেয়ে তাঁর আজ সেইসব কথা দ্রুত মনে পড়তে লাগল। যদিও সঙ্গে পিস্তল রাখলে এখন আর বিশেষ লাভ নেই। ডেল্টা তাঁর পিস্তলের পাল্লায় বোকার মতো এসে তো হাজির হবে না। তবু চামড়ার শোলডার হোলস্টারটা বের করে গলায় পরে নিলেন। পিস্তলটা রইল বাঁ বগলের একটু নীচে, খাপের মধ্যে। গায়ে জামা থাকলে বাইরে থেকে বোঝাই যাবে না জিনিসটার অস্তিত্ব।

জামা গায়ে দিয়ে যখন দরজা খুলে বেরোলেন, তখন দেখলেন পলাশ বিবর্ণ মুখে বসবার ঘরে দাঁড়িয়ে আছে।

“কাকাবাবু!”

বাবু মিত্তির শান্ত গলাতেই বললেন, "কী হয়েছে?"

"রাম পহলওয়ান তার ঘরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। মুখে গ্যাঁজলা উঠছে। এখনই হাসপাতালে নেওয়া দরকার।"

বাবু মিত্তির দুঃখিতভাবে মাথা নাড়লেন, "আমার একার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত কতজনকে করতে হবে তা বুঝতে পারছি না। অ্যাম্বুলেন্সে একটা খবর দাও।"

"দিয়েছি। এখন আর কী করব?"

"তুমি ঘাবড়ে গেছ। মাথা ঠাণ্ডা রাখো। ডেল্টার সঙ্গে পাল্লা টানতে আসা তোমার উচিত হয়নি। আমি বলি কি, তুমি বরং ফিরেই যাও। আমার পরিণতি তো বুঝতেই পারছ।"

"পারছি। তবু ব্যাপারটার শেষ দেখতে চাই।"

"একেবারে ড্রপসিন পড়ার পর যাবে? কিন্তু ততক্ষণে যদি তোমার জীবনেও ড্রপসিন নেমে আসে?"

"প্রাণের ভয় আমার ততটা নেই। কিন্তু ভয় পাচ্ছি, আমার অসহায় অবস্থাকে। ডেল্টার সঙ্গে একটু লড়াই হল না, বিনা যুদ্ধে এ তো একেবারে কাপুরুষের মতো মরতে হবেই দেখছি।"

"বীরের মতো লড়লেও লাভ ছিল না। ডেল্টা বীরদেরও ঢিট করতে জানে।"

একটু বাদে অ্যাম্বুলেন্স এল এবং রাম পহলওয়ানের অচেতন দেহটা তুলে নিয়ে চলে গেল। পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা দেখলেন বাবু মিত্তির। চোখের কোণে জল টলটল করছিল।

৩. কালীপুরের সবচেয়ে বিখ্যাত জিনিস

কালীপুরের সবচেয়ে বিখ্যাত জিনিস হল তার কালীবাড়ি। বাদা অঞ্চলের এই দুর্গম গাঁয়ে লোকজনের যাতায়াত কম। তবু লোকে ওই কালীবাড়ির টানে কষ্ট সয়েও আসে। শোনা যায় পর্তুগিজ বোম্বেটের আমলে একজন দেশি ডাকাতও খুব মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। তার নাম তারাপ্রসাদ। এ-গাঁয়ের প্রতিষ্ঠাতা সে-ই। কালীবাড়িও তার প্রতিষ্ঠা করা। ডাকাত তারাপ্রসাদ গরিবের বন্ধু ছিল, দানধ্যান ছিল প্রচুর। পর্তুগিজ বোম্বেটেদের সঙ্গে লড়াইও সে করেছে এলাকা দখলের জন্য। তখনকার শাপদসঙ্কুল সুন্দরবনে সে অকুতোভয়ে দলবল নিয়ে ঘুরে বেড়াত নৌকো এবং ছিপে। লোকে বলত, তারাপ্রসাদ পিশাচসিদ্ধ।

তারাপ্রসাদ নেই, তবে তার প্রতিষ্ঠিত গাঁ এবং কালীবাড়ি আছে। আর আছে তার এক বংশধর। কালীপ্রসাদ। তারাপ্রসাদকে লোকে ভয় পেত। কালীপ্রসাদকেও সবাই দারুণ ভয় খায়। তার কারণ কালীপ্রসাদ অতিশয় রহস্যময় পুরুষ। যেমন গম্ভীর তেমনই অমিশুক, কালীপুরের মায়ের মন্দিরের পিছনে কয়েক ফার্লং দূরে কালীপ্রসাদের বিশাল বাগানঘেরা পাকা বাড়ি। সেই বাড়িতে কালীপ্রসাদ ছাড়া আর থাকে একজন রান্নার লোক এবং একজন কাজের লোক। এ-দু'জন কালীপুরের বাসিন্দা নয়, কালী প্রসাদ অন্য জায়গা থেকে এদের আনিয়েছেন। কাজের লোকটি বোবা এবং কালা, পাঁচক ঠাকুরটি অত্যন্ত কম কথার মানুষ। কালীপ্রসাদের সঙ্গে গাঁয়ের লোকের বিশেষ ভাবসাব নেই। তাঁর বাড়িতে কেউ কস্মিনকালে যায় না। পুজোর চাঁদা তুলতে বা বিজয়ার কোলাকুলি করতেও নয়। কারণ কালীপ্রসাদ ওসুব পছন্দ করেন না।

কালীপ্রসাদ সম্পর্কে গাঁয়ে নানা কিংবদন্তি আছে। তার মধ্যে একটা হল, কালীপ্রসাদ ভূত পোষেন। তাঁর পোষা ভূতের সংখ্যা কারও মতে সাত, কারও মতে সতেরো। কালী প্রসাদের বাড়িতে নিশুত রাতে হঠাৎ-হঠাৎ প্রচণ্ড আলোর ঝলকানি দেখা যায়, লাল-নীল ধোঁয়া ওড়ে, বিচিত্র সব শব্দ হয়। অনেকে দেখেছে, অনেকে শুনেছে। কালীপ্রসাদ ভূত

পোষেন কি না তা হলফ করে বলা যাবে না, তবে একসময়ে বাঘ পুষতেন। সুন্দরবনের বিখ্যাত রয়েল বেঙ্গল বাঘের একটা বাচ্চা জঙ্গলের কোথাও কুড়িয়ে পেয়ে নিয়ে আসেন। সেটা ধীরে ধীরে বিরাট আকারের কেঁদো হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কয়েক বছর আগেও সেটা স্বাধীনভাবে বাড়ির ভেতরে ঘুরে বেড়াত। সেটা মারা গেছে। এখন কালীপ্রসাদ পায়রা পোষেন। তাঁর নানারকমের অনেক পায়রা আছে।

যৌবনকালে কালীপ্রসাদ কলকাতায় থাকতেন। বিজ্ঞানের মেধাবী ছাত্র ছিলেন। খুবই ভাল ফুটবল খেলতেন। কলেজে তাঁর সহপাঠী ছিলেন বিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা বাবু মিত্তির। দুজনের দারুণ বন্ধুত্ব হয়ে যায়। পরে বাবু মিত্তির বিদেশে চলে যান। কালী প্রসাদের সঙ্গে তারপর থেকে আর যোগাযোগ ছিল না। দীর্ঘদিন বিদেশে কাটিয়ে বাবু মিত্তির ফিরে এসে যখন সংসারী হতে চাইলেন, তখন তাঁর বিয়ের নেমন্তন্ন পেয়ে কালীপ্রসাদ গিয়েছিলেন। দুই বন্ধুতে তখন খুব পুরনো দিনের কথা হয়। তারপর থেকে আবার কালীপ্রসাদ যাওয়া-আসা করতেন, বাবু মিত্তিরও সপরিবারে এসে কয়েকবার কালীপুরে কাটিয়ে গেছেন। চণ্ড রাগ আর দুর্ব্যবহারের জন্য বাবু মিত্তিরকে কেউ পছন্দ করে না বটে, কিন্তু কালীপ্রসাদকে বাবু মিত্তির বরাবরই একটু আলাদা খাতির করেন।

চিরকাল সমান যায় না। বাবু মিত্তির ব্যবসা করে হঠাৎ টি বড়লোক হয়ে গেলেন, ব্যস্ততা বাড়ল। কালীপ্রসাদও আর ঘন-ঘন যেতেন না। মেলামেশাটা কমে গেল। তারপর একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল।

বছরদশেক আগে হঠাৎ একদিন সন্ধেবেলা শোকার্ত চেহারায় একটি কিশোর এসে হাজির হল।

“আমাকে চিনতে পারছেন?”

কালীপ্রসাদের বুদ্ধি, স্মৃতি ও অনুমানশক্তি অত্যন্ত প্রখর। তিনি চিনতে পেরে চমকে উঠে বললেন, “তুই তো রকি! কী হয়েছে?”

রকি অনেকক্ষণ কান্নাকাটি করল। তারপর মায়ের মৃত্যুসংবাদ জানিয়ে বলল, "বাবার সঙ্গে থাকলে আমি পাগল হয়ে যাব। বাবা আমাকে ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ান বক্সার করতে চায়। আমি তা চাই না। মা মারা যাওয়ার আগে আমাকে বলে গেছে, তিনি যদি না বাঁচেন তবে তাঁর মৃত্যুর পর আমি যেন আপনার কাছে চলে আসি। কালীকাকা, আপনি আমাকে যদি আশ্রয় নাও দেন তবু দয়া করে বাবাকে আমার খোঁজ দেবেন না। বাবা তা হলে আমাকে ধরে নিয়ে যাবে।"

কালীপ্রসাদ এই দুর্বলচিত্ত ছেলেটির সমস্যা বুঝতে পারলেন। বাবু মিত্তির যে জেদি ও অবুঝ মানুষ তাও তিনি ভালই জানেন। তাই বললেন, "তোর ভয় নেই। আমার কাছেই থাক। বাবু জানতে পারবে না।"

রকি সভয়ে বলল, "বাবা যদি খুঁজতে-খুঁজতে এখানে চলে আসে?"

কালীপ্রসাদ মাথা নেড়ে বললেন, "আসবে না। তার কারণ তুই যে কালীপুরের রাস্তা চিনে আসতে পারবি সেটাই তার বিশ্বাস হবে না। তুই তো বোধ হয় পাঁচ-ছয় বছর বয়সে এখানে শেষবার এসেছিস। চিনলি কী করে?"

"কালীপুর নামটা মনে ছিল। মা বলে দিয়েছিল। জিজ্ঞেস করে করে চলে এসেছি।"

কালীপ্রসাদ একটু চিন্তা করে বললেন, "এসে যখন পড়েছিস তখন আর ভাবনা নেই। তবে গাঁয়ে থাকার দুটো অসুবিধে আছে। নতুন লোক দেখলে গাঁয়ের মধ্যে কথা উঠবে আর সেটা ছড়িয়ে পড়তেও দেরি হবে না। দ্বিতীয় অসুবিধে হল, এখানে থাকলে তোর লেখাপড়া হবে না। কয়েকটা দিন থাক, তোর মায়ের শ্রাদ্ধশান্তি এখানেই কর। তারপর কিছু একটা ঠিক করা যাবে।"

কালীপ্রসাদ রকিকে কালীপুরে রাখেননি। তাঁর পয়সার অভাব নেই। তারা-ডাকাতের কল্যাণে সোনাদানা, হিরে-জহরত, রুপোর বাঁট, বাসনকোসন যা ছিল তার দাম লাখ-লাখ টাকা। পাপের রোজগার বলে কালীপ্রসাদ তাতে হাত দেননি, বিলিয়েও দেননি।

তারাপ্রসাদের সেই গুপ্ত সম্পদ এবার রকির কাজে লাগালেন। তাকে দিল্লিতে পাঠিয়ে দিলেন লেখাপড়া করতে। পরে রকি নিজের যোগ্যতাতেই বিদেশে চলে যায়। সম্প্রতি সে ফিরে এসে কালীপ্রসাদের সঙ্গে দেখা করে। এখন সে মস্ত এঞ্জিনিয়ার। লম্বা-চওড়া চেহারা হয়েছে।

এসে বলল, "বাবা হয়তো এখনও আমার ওপর রাগ করে আছে। আমার হুট করে তাঁর কাছে যেতে সাহস হয় না। তবু আমি বাবাকে জানাতে চাই যে, আমি বেঁচে আছি এবং বক্সার না হলেও আমি আমার মতো হয়েছি।"

কালী প্রসাদ একটু ভেবে বললেন, "যতদূর জানি বাবুর শরীর ভাল নয়। পারকিনসন্স ডিজিজ হয়েছে। হার্ট খুব মজবুত নয়। হুট করে খবর দিলে হয়তো ভীষণ শক লাগবে। হঠাৎ করে আনন্দটাও ভাল ব্যাপার নয়। তুই ভাবিস না। খবরটা আমি সইয়ে-সইয়ে দেব' খন। "

রকি আমেদাবাদে তার কর্মস্থলে ফিরে গেল। কালীপ্রসাদ তাঁর পোষা দুটি শিক্ষিত পায়রা নিয়ে দেখা করতে গেলেন বাবুর সঙ্গে।

অনেক কথা হল দুজনে। কালীপ্রসাদ বুঝতে পারলেন, হারানো ছেলের জন্য তৃষ্ণার্ত হয়ে আছেন বাবু মিত্তির। কিন্তু সেই উৎকণ্ঠাটা এতই প্রবল যে, ছেলের খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাবু মিত্তির হয়তো হার্টফেল করবেন।

সুতরাং কালীপ্রসাদ নানা কথা ফাঁদলেন। বললেন, "হ্যাঁ রে, তুই কি ভূতে বিশ্বাস করিস?"

বাবু মিত্তির অবাক হয়ে বললেন, "হঠাৎ ভূতের কথা কেন?"

"করিস কি না বল না।"

"আগে করতাম না। আজকাল মন্ত্র-তন্ত্র, ভূত-প্রেত সব বিশ্বাস করি। রকির খোঁজে আমি তো দু দফায় দু'জন তান্ত্রিককেও লাগিয়েছিলাম। জ্যোতিষীরাও কম পয়সা নেয়নি।"

"কালীপুরে সবাই বলে, আমার নাকি পোষা ভূত আছে।"

বাবু মিত্তির হাসলেন। বললেন, "সেটা শুনেছি।"

"বিশ্বাস করিস?"

"তোর যে পোষা ভূত আছে সেটা কি তুই নিজেই বিশ্বাস করিস?"

কালীপ্রসাদ খুব গম্ভীর হয়ে বললেন, "যদি বলি আছে, বিশ্বাস করবি?"

বাবু মিত্তির হেসে বললেন, "তোর অনেক খ্যাপামি আছে জানি। ওই অজ পাড়াগাঁয়ে ল্যাবরেটরি বানিয়ে নানা আজগুবি এক্সপেরিমেন্ট করিস, গাঁয়ের লোক সেটাকেও ভৌতিক ব্যাপার বলে ভয় খায়। আমাকেও কি ওদের দলে ফেলতে চাস?"

"আমি কোনও আজগুবি এক্সপেরিমেন্ট করি না। বিকল্প বিদ্যুতের উৎস খোঁজার জন্য আমি প্রাণপাত পরিশ্রম করে যাচ্ছি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কোটি-কোটি টাকা খরচ হচ্ছে এই গবেষণায়। মাটির নীচে কয়লা আর তেল ফুরিয়ে আসছে। একুশ শতকের গোড়ায় যদি বিকল্প শক্তির উৎস না বের করা যায় তা হলে মানুষের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। আমাদের অত টাকা নেই। আমি শস্তা এবং সহজ উপায়ে কিছু করা যায় কি না সেই চেষ্টা করছি। হয়তো লাভ হবে লবডঙ্কা, কিন্তু কাজ একটু এগিয়ে রেখে যাচ্ছি। তার রেকর্ডও থাকছে। যদি কেউ আমার কাজের ফাঁক-ফোকর-ত্রুটি শুধরে পরবর্তীকালে কিছু করতে পারে তাতে আখেরে মানুষের লাভই হবে।"

"সে তো বুঝলাম। কিন্তু এর মধ্যে ভূত আসছে কোথা থেকে?"

কালীপ্রসাদ হাসলেন। বললেন, “ভূতের ব্যাপারটা কিছুদিন হল ঘটছে। বিয়ে-টিয়ে করিনি, আমার সংসার বলতেও কিছু নেই। একা মানুষ তো, নানারকম বাতিক দেখা দেয়। আমি কিছুদিন আগে নিশুত রাতে একা-একা প্ল্যানচেট করার চেষ্টা করতাম। কীরকম করে করতে হয় তা জানি না। একা ঘরে বসে একটা মোম জ্বেলে খুব একাগ্রতার সঙ্গে আমার দাদু শিবপ্রসাদকে ভাবতে শুরু করি। রোজ একই প্রসেস। দিন-সাতেক রোজ একইভাবে তাঁকে চিন্তা করতে করতে এবং তাঁকে

চাক্ষুষ করার আগ্রহ বাড়াতে বাড়াতে একদিন হঠাৎ বন্ধ ঘরের মধ্যে মোমবাতির শিখাটা কেমন যেন এঁকেবেঁকে লতিয়ে উঠতে লাগল। তারপর নিভে গেল। আমি চুপ করে শ্বাস বন্ধ করে বসে রইলাম। মনে হচ্ছিল, ঘরে আমি একা নই। আরও কেউ একজন আছে। ভয় বলে আমার কিছুই নেই। তবে একটা দুশ্চিন্তা হচ্ছিল, যা অনুভব করছি তা সত্য কি না। খানিকক্ষণ পর হঠাৎ খুব ক্ষীণ একটা ফিসফিসানি শুনতে পেলাম, ‘আমি তোমার দাদু শিবপ্রসাদ। কী জানতে চাও বলো! আমি ভয় পাইনি, তবু কেমন যেন শরীরটায় ঠাণ্ডা একটা স্রোত বয়ে গেল। আমার নিজের অনেক কিছু জানার আছে। তাই প্রথমেই জিজ্ঞেস করলাম, পৃথিবীতে বিকল্প শক্তির আবিষ্কার সম্ভব হবে কি না।’ দাদু জবাব দিলেন, “আমি সবজান্তা নই। আরও কয়েকটা প্রশ্ন করে বুঝলাম, দাদু জবাব দিতে চাইছেন না। তখন প্রশ্ন করলাম, আমার বন্ধু বাবু মিত্তিরের নিরুদ্দেশ ছেলে রকি কি বেঁচে আছে? দাদু এবার কিন্তু বেশ জোর গলায় বললেন, ‘আছে।’ শুনে খুব একটা আনন্দ হল। বললাম, ‘কোথায় এবং কেমন আছে? দাদু বললেন, ‘বেশি বলা সম্ভব নয়। তবে ভাল আছে।”

বাবু মিত্তির ঘটনাটা শুনতে-শুনতে কেমন যেন লাল হয়ে গেলেন। তারপর হঠাৎ উঠে দ্রুতবেগে পায়চারি করতে লাগলেন। তারপর হঠাৎ ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ে হাঁফাতে লাগলেন। সবাঙ্গ ঘামে ভেজা।

কালীপ্রসাদ বন্ধুর অবস্থা দেখে শঙ্কিত হয়ে পড়লেন। ছেলের জন্য নীরবে গোপনে দুশ্চিন্তা করতে করতে বাবু যে নিজের জীবনীশক্তিকে নিংড়ে দিয়েছেন, তা খুব গভীরভাবে বুঝতে পারলেন কালী প্রসাদ।

বাবু মিত্তির স্বাভাবিক হতে অনেক সময় নিলেন। তারপর ফ্যাঁসফ্যাঁসে হাঁফধরা গলায় বললেন, "কালীপ্রসাদ, তুই যা বলছিস তা যে সত্যি তা আমাকে ছুঁয়ে বল।"

কালীপ্রসাদ নির্দ্বিধায় বন্ধুর হাত স্পর্শ করে বললেন, "তোর ছেলে যে বেঁচে আছে তাতে আমার কোনও সন্দেহ নেই।"

"আমি তার খবর চাই।"

"খবর পেলেই আমি তোকে জানাব, দাদুর সঙ্গে আমি আবার কথা বলবার চেষ্টা করব।"

"তুই থাকিস সুন্দরবনে, দুর্গম জায়গায়। আমি খবর পাব কী করে?"

কালীপ্রসাদ হাসলেন, বললেন, "সেইজন্যই আমার পায়রা-দূত নিয়ে এসেছি। তুইও আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবি, আমিও পারব।"

বাবু মিত্তিরকে রকির খবরটা পুরো জানাতে কেন যেন ইচ্ছে হল না তাঁর। কেন যেন মনে একটা বাধা অনুভব করছিলেন কালীপ্রসাদ। তাড়া নেই, খবরটা দু-চারদিন পরে দিলেও হবে।

কলকাতা থেকেই তিনি আমেদাবাদে ট্রাঙ্ককল করে রকিকে সব জানিয়ে বললেন, "ভূতের গল্প বানিয়ে বলতে হয়েছে। সাধারণভাবে বাবুর পক্ষে গল্পটা বিশ্বাস করা সম্ভব হত না। কিন্তু এখন মানসিক অবস্থা এত খারাপ যে, বিশ্বাস করেছে।"

রকি করুণ গলায় বলল, "বাবার জন্য আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। কালীকাকা।"

"কষ্ট হোক, তবু দুম করে ফোনটোন করে বসিস না যেন। ও তোর গলা শুনলে না হার্টফেল করে। ক'দিন একটু সয়ে যাক। সময় বুঝে আমি যা করার করব।"

কালীপ্রসাদ গাঁয়ে ফিরে এলেন। আর এসেই পড়লেন মুশকিলে।

কালীপ্রসাদ বিজ্ঞানী মানুষ। ভূতের গল্প বানিয়ে বললেও তাঁর বাস্তবিক ভূতে কোনও বিশ্বাস নেই। ওসব নিয়ে চিন্তাভাবনাও করেননি কখনও। থাকেন নিজের কাজ নিয়ে। বিশাল বাড়ির একতলার হলঘরে ল্যাবরেটরি। সেখানেই তাঁর দিনের বেশির ভাগ সময় কাটে। নানারকম রাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়া, পাথর, ধাতু, গাছ-গাছড়া সবকিছু নিয়েই তিনি কাজ করেন। প্রতিদিনকার কাজের নোট রাখে। এসব নিয়ে এত ব্যস্ত থাকেন যে, অন্য কিছু নিয়ে ভাববার অবকাশই তাঁর নেই।

কিন্তু যেদিন বাবু মিত্তিরকে ভূতের গল্প শুনিয়ে গাঁয়ে ফিরে এলেন সেই রাতেই একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল।

অনেক রাতে ল্যাবরেটরির কাজ শেষ করে যখন ওপরে দোতলায় শোওয়ার ঘরে ঘুমোতে এলেন, তখন কালীপুর এক শব্দহীন ঘুমের পুরী। বেশ শীত পড়েছে। চারদিকে ঘন কুয়াশা। শিশির পড়ার টুপটাপ শব্দ হচ্ছে।

ঘরের দরজা বন্ধ করে বাতি নিভিয়ে লেপের তলায় ঢুকবার পরই তাঁর হঠাৎ মনে হল, ঘরে তিনি একা নন। আর কেউ আছে। কোনও শব্দ হয়নি বা কিছু চোখেও পড়েনি। তবু মনে হল। তিনি টর্চ জ্বেলে ঘরটা দেখলেন। কেউ কোথাও নেই। খাটের তলাও ফাঁকা। তবে কি মনের ভুল? তাই হবে। কালীপ্রসাদ চোখ বুজলেন। কিন্তু কেমন একটা অস্বস্তি হতেই লাগল।

একটা দীর্ঘশ্বাসের মতো শব্দ হল কি? কালীপ্রসাদ উঠে বসলেন। হাতে টর্চ। মৃদুস্বরে বললেন, "কে?"

কেউ জবাব দিল না। কিন্তু দেওয়ালঘড়িতে টং করে একটা শব্দ হল। রাত একটা বাজে কি? নাকি সাড়ে বারোটা? নাকি দেড়টা? ঘড়ি দেখে চলার অভ্যাসই নেই কালী প্রসাদের। বাদা অঞ্চলের গাঁয়ে ঘড়ি ধরে চলার কোনও কারণও তো নেই। কালী প্রসাদ কদাচিৎ ঘড়ির দিকে তাকান। সময়টা তাই ধরতে পারলেন না। খাট থেকে নেমে চারদিকটা তন্ন-তন্ন করে দেখলেন টর্চ জ্বেলে। কোথাও কেউ নেই।

বারান্দায় এসে দেখলেন, বাইরে কুয়াশায় মাখা জ্যোৎস্নায় বনে-জঙ্গলে যেন এক অপ্রাকৃত কিছুর সঞ্চার হয়েছে। এ যেন চেনা কালীপুর নয়। স্বপ্নে দেখা কোনও জায়গা।

সিঁড়ি দিয়ে একটা অস্পষ্ট পায়ের শব্দ নেমে যাচ্ছে কি? কালীপ্রসাদ তাড়াতাড়ি গিয়ে সিঁড়ির মুখ থেকে নীচে আলো ফেললেন। কাউকে দেখা গেল না। কিন্তু স্পষ্ট শুনতে পেলেন একজোড়া ভারী চটির শব্দ যেন সন্তর্পণে নীচে নেমে একতলার দরদালান দিয়ে ল্যাবরেটরির দিকে যাচ্ছে।

কালীপ্রসাদ সাহসী মানুষ। তবু একটু বিহ্বল বোধ করতে লাগলেন। এরকম অভিজ্ঞতা তাঁর নতুন। তিনি ঘরে এসে তাঁর মোটা লাঠিগাছটা নিয়ে একতলায় নেমে এলেন। এ-অঞ্চলে এমন কোনও চোর নেই, যে কিনা তাঁর বাড়িতে হানা দেওয়ার সাহস রাখে। কালী প্রসাদকে সবাই

ভয় খায়। তবে আজ কোন চোরের এমন বুকের পাটা দেখা দিল?

তিনি পায়ের শব্দ না করে ল্যাবরেটরির দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন। দরজা ভেজানোই থাকে। তালা দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন না। কারণ, একতলার সদর দরজা বন্ধ থাকলে কেউ ঢুকতে পারে না। বাইরে থেকে কান পেতে ভেতরে কোনও শব্দ হচ্ছে কিনা শোনার চেষ্টা করছিলেন তিনি। এমন সময়ে কে যেন তাঁর কাঁধে খুব মৃদু একটা চাপড় দিল।

কালীপ্রসাদ চমকে ফিরে তাকালেন। কেউ নেই। একটু হতভম্ব বোধ করলেন তিনি।স্পষ্ট টের পেয়েছেন, কাঁধে কেউ চাপড় দিয়েছে! লোকটা কি হাওয়ায় মিলিয়ে গেল? কালীপ্রসাদ শরীরে একটা শীতল শিহরন অনুভব করেও লজিক হারালেন না। এমনও হতে পারে একটা চামচিকে উড়তে-উড়তে তাঁর পিঠে পাখার ঝাঁপটা দিয়েছে। ব্যাখ্যাটা খুব মনঃপূত হল না তাঁর, তবু লজিক্যাল বলে মনে হল।

ল্যাবরেটরির মধ্যে কোনও শব্দ ছিল না। কিন্তু হঠাৎ খুব ক্ষীণ একটা কাঁচের শব্দ শুনে কালীপ্রসাদের দৃঢ় ধারণা হল, ল্যাবরেটরিতে চোর বা আগন্তুক কেউ ঢুকে পড়েছে। তিনি দরজাটা আস্তে করে খুলে ভেতরে ঢুকলেন।

ঘর নিরেট অন্ধকার। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কাঁচের পাত্র নাড়াচাড়ার একটা ক্ষীণ শব্দ শুনেছিলেন, এখন অবশ্য কোনও শব্দ নেই। কালীপ্রসাদ টর্চ জ্বেলে দেখলেন, তারপর ইনভার্টার চালু করে আলো জ্বেলে তন্ন-তন্ন করে খুঁজলেন। কেউ কোথাও নেই। চিন্তান্বিত কালী প্রসাদ আলো নিভিয়ে যখন ল্যাবরেটরি থেকে বেরোতে যাবেন, ঠিক তখনই কে যেন আবার তাঁর পিঠে খুব আলতো করে একটা চাপড় দিল। কালীপ্রসাদ আবার চমকে উঠলেন। টর্চ জ্বেলে, বাতি জ্বেলে ফের দেখলেন। কেউ কোথাও নেই।

চামচিকেই হবে, ভেবে নিয়ে কালীপ্রসাদ দরদালানে বেরিয়ে এসে যখন দোতলায় উঠতে যাবেন তখন আর চাপড় নয়, কে যেন তাঁর কাঁধে আলতো করে হাত রাখল। কালীপ্রসাদ হাতটা ধরার জন্য একটা থারা দিলেন। হাতটা সরে গেল।

বাদা অঞ্চলের অজ পাড়াগাঁয়ে তাঁর জন্ম, বাঘ অবধি পুষেছেন, অসমসাহসী কালীপ্রসাদ ভয় কাকে বলে তা জানতেনই না। কিন্তু এখন হঠাৎ ভয় যেন বাঘের মতোই সাপটে ধরল তাঁকে। শরীরটা কেমন ঠাণ্ডা আর শক্ত হয়ে যেতে লাগল। ভেতরে একটা কাঁপুনি। মাথাটা ঝিমঝিম। তাঁর দু'জন কাজের লোক তিনতলার ছাদে দুখানা ঘরে থাকে। তাদের ডাকার মতো ক্ষমতাই নেই কালী প্রসাদের। এমনকী সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় অবধি উঠতে

পারছেন না। শরীরটা যেন সাতমন ভারী হয়ে গেছে। এই অবস্থাকেই কি স্তম্ভন বলে? নাকি তাঁর স্ট্রোক হয়ে গেল? মাথায় কোনও গণ্ডগোল হয়ে যায়নি তো!

সিঁড়ির গোড়ায় কালীপ্রসাদ অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। এক পাও নড়তে পারলেন না। হঠাৎ টের পেলেন, তাঁর কানের কাছে অনেক মশা যেন পিনপিন শব্দ করে উড়ে বেড়াচ্ছে। এত মশা কোথা থেকে এল তা বুঝতে পারলেন না। চাষবাসে পোকা মারার ওষুধ দেওয়ার ফলে আজকাল আর এ-অঞ্চলে মশা বিশেষ নেই। তার ওপর কালী প্রসাদের বাড়িতে রোজ রিপেলেন্ট স্প্রে করা হয়।

হঠাৎ কালীপ্রসাদের মনে হল, মশা বলে যাদের ভাবছেন তারা মশা নয় হয়তো। কারণ পিনপিন শব্দটা একটু অন্যরকম। কালীপ্রসাদ স্থির দাঁড়িয়ে থেকে মনোযোগ দিয়ে শব্দটা শুনবার চেষ্টা করলেন। খানিকক্ষণ চোখ বুজে প্রায় ধ্যানস্থ থাকার পর তিনি বুঝতে পারলেন, মশার শব্দ বলে যা মনে হয়েছিল আসলে তা খুব চিকন, খুব মিহি, খুব মৃদু একটা গলার স্বর। এই অপ্রাকৃত ঘটনায় তাঁর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। তবু প্রাণপণে নিজেকে সংযত রাখলেন। ভাবলেন, যা হওয়ার হবে।

চোখ বুজে ফের ধ্যানস্থ হয়ে গলার স্বরটাকে শোনার ও বোঝার চেষ্টা করতে লাগলেন কালী প্রসাদ। দোতারা বা ওই ধরনের তারের যন্ত্রের মতো স্বরটা প্রথমে সঙ্কেতধ্বনি বলে মনে হচ্ছিল। তারপর একটা-দুটো শব্দ ওর মধ্যেই বুঝতে পারলেন। কে যেন বলছে, তুমি মিথ্যাচারী! তুমি মিথ্যাচারী!

কালীপ্রসাদ অস্ফুট গলায় বললেন, “আপনি কে?”

“তারাপ্রসাদ।”

কালীপ্রসাদ সভয়ে বললেন, “আমার প্রণাম। আমি কী অপরাধ করেছি?”

“বন্ধুর কাছে পূর্বপুরুষের মিথ্যে গল্প বলেছ।”

"বন্ধুকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বলেছি। ক্ষমা করুন।"

"তোমার ঠাকুদার আত্মার অপমান হয়েছে।"

"অপরাধ হয়েছে। আর করব না।"

"তুমি অকৃতজ্ঞ। তুমি জানো যে, তোমার পূর্বপুরুষেরা সর্বদাই তোমাকে ঘিরে থাকেন! সর্বদাই তোমার মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করেন!"

"আজ্ঞে, জানতাম না।"

"তোমার বন্ধু পাপী লোক। তার কর্মফল ফলবেই। তুমি ওর মধ্যে যাবে না।"

"যে আজ্ঞে। কিন্তু তার ছেলেটা যে ভাল।"

"বাবু মিত্র অপঘাতে মরবে। দিন ঘনিয়ে আসছে।" কালীপ্রসাদ শিহরিত হলেন। বাবু মিত্তিরের অতীতের কিছুটা যে ভাল নয় তা তিনি জানেন। কিন্তু বন্ধুর প্রতি তাঁর একটা গভীর ভালবাসাও আছে। করুণ স্বরে বললেন, "তাঁকে বাঁচানোর কি কোনও উপায় নেই?"

"তুমি তাকে বাঁচাতে চাও?"

"চাই।"

"তা হলে একেবারে চুপ করে থাকো, তার উপকার করতে গেলে অপকারই হবে। মিথ্যাচার করে বংশে কালি দিয়ো না।"

"যে আজ্ঞে।"

“পূর্বপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা না থাকলে কিছুই করতে পারবে না। তুমিই আমাদের বংশের শেষ বংশধর। তোমার পর এই বংশ লুপ্ত হয়ে যাবে। তাতে আমরা দুঃখিত নই। শেষ বংশধর হিসেবে তোমার গুরুত্ব অনেক। সেটা ভুলে যেয়ো না।”

“যে আজ্ঞে। কিন্তু বাবু মিত্তিরের কী ব্যবস্থা হবে?”

“যথাসময়ে দেখা যাবে।” কানেব পিনপিন শব্দ হঠাৎ মিলিয়ে গেল। তারাপ্রসাদ বিদায় নিলেন। কালীপ্রসাদও ফের স্বাভাবিক হলেন। প্রথমটায় প্রচণ্ড ভয় পেলেও ধীরে ধীরে তারাপ্রসাদের সঙ্গে বাক্য বিনিময় করতে গিয়ে ভয়টা কেটে গেছে। কালীপ্রসাদ রাতটা আর ঘুমোলেন না, সাধন-ভজন করে কাটিয়ে দিলেন।

এই ঘটনার বেশ কিছুদিন বাদে বিকেলের দিকে তাঁর বাতাবাহী পায়রাটা উড়ে এল। পায়ে কৌটোয় বাঁধা চিরকুট। তাতে লেখা, “আমার জীবন সংশয় দেখা দিয়েছে। ডেল্টা তার প্রতিশোধ নিতে শুরু করেছে। মৃত্যু ঘনিয়ে এল। আমার ছেলেটার খবর দয়া করে যদি দিস তা হলে এ-সময়ে সেইটেই হবে আমার সবচেয়ে বড় পাওনা। ডেল্টা ইতিমধ্যে আমার কুকুরটাকে মেরেছে। তুই দেরি করিস না। ”

কালীপ্রসাদ চিরকুটটা হাতে নিয়ে চুপ করে বসে রইলেন। কী করবেন তা ভেবে পেলেন না। কিন্তু তারাপ্রসাদের আদেশ অগ্রাহ্য করা যে উচিত হবে না সেটাও তিনি জানেন। রকিকে কি খবরটা দেবেন? বুঝতে পারলেন না।

রাত গম্ভীর হল। কালীপ্রসাদ তাঁর ল্যাবরেটরিতে অনেকক্ষণ কাজ করে ক্লান্ত বোধ করছেন। প্রায় তিনদিনের গবেষণার কথা লিখতে লিখতে আঙুল ব্যথা করছে। শোবেন বলে উঠতে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তাঁর ডান হাতটা এগিয়ে গিয়ে কলমটা তুলে নিল। তারপর সাদা কাগজের ওপর কলমটা যেন কিছু লিখতে লাগল। এই অদ্ভুত অবৈজ্ঞানিক কাণ্ড দেখে কালীপ্রসাদ প্রথমটায় হতচকিত হয়ে পড়লেও সামলে নিলেন। ডান হাতকে তার কাজ করে যেতে দিয়ে নিজে চুপ করে বসে রইলেন।

মিনিটপাঁচেক দ্রুতবেগে লেখার পর হাতটা থামল।

কালীপ্রসাদ ঝুঁকে পড়ে দেখলেন, কাগজে লেখা হয়েছে :

বাবু মিত্তিরের আশঙ্কা অমূলক নয়। বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি তো আছেই। ডেল্টা তাকে সহজ উপায়ে মারবে না। মারবে কষ্ট দিয়ে। সে যা অনুমান করছে, সেভাবে নয়। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত দিক থেকে তার মৃত্যু আসবে। ধীরে-ধীরে তিল-তিল করে যন্ত্রণা সয়ে মরতে হবে তাকে। তুমি তার উপকার করতে চাও জানি। তুমি আমাদের শেষ বংশধর। তোমাকে আমরা সাহায্য করতে চাই। কাল সকালে পায়রা মারফত তুমি তাকে লিখে পাঠাও, যেন সে কোনওক্রমেই কাল তার বিছানায় না শোয়। কাল তার চাঁদরের তলায় একটি ছুঁচের মতো জিনিস রাখা থাকবে। এটি সাধারণ জিনিস নয়, একটি তেজস্ক্রিয় শলাকা। যদি সে বিছানায় শোয় তবে অবধারিত তার কর্কট রোগ দেখা দেবে। ওটি যেন বেশ সাবধানে চিমটে দিয়ে ধরে মাটিতে গভীর গর্ত করে পুঁতে ফেলা হয়। বিছানাটাও ফেলে দেওয়া উচিত। কিন্তু সবটাই করতে হবে গোপনে। কেউ জানতে পারলে বাবু মিত্তিরের ঘাতকরাও জেনে যাবে। খুব সাবধান। তাকে কিছুতেই তার ছেলের খবর দিয়ো না।

.

কালীপ্রসাদ চমৎকৃত হলেন। পূর্বপুরুষদের প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাঁর মাথা নত হয়ে এল। তিনি এটাও বুঝতে পারলেন, রকির খবর কেন বাবুকে জানানো উচিত নয়। কারণ, বাবু মিত্তির যদি জানতে পারে তা হলে সে ছেলের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য উদ্যোগ নেবেই। আর তখন তার ঘাতকরাও জেনে যাবে যে, তার ছেলে বেঁচে আছে। হৃদয়হীন ডেল্টা তখন প্রথমেই মারবে বাবুর ছেলেকে। বোধ হয় এইজন্যই তিনি বাবু মিত্তিরকে রকির খবর দিতে গিয়েও দিতে পারেননি। ভেতরে-ভেতরে একটা বাধা পেয়েছিলেন। সেও কি তাঁর পূর্বপুরুষদেরই কাজ? তাই হবে।

চিন্তা-ভাবনায় রাতটা আর ঘুমোতে পারলেন না কালীপ্রসাদ। ভোরবেলা উঠেই পায়রার পায়ে চিরকুট বেঁধে ছেড়ে দিলেন। কিন্তু তবু নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। নিজেও তৈরি হয়ে নিলেন। তারপর বেরিয়ে পড়লেন।

কলকাতায় এসেই তিনি প্রথমে ট্রাঙ্ককল করলেন আমেদাবাদে, রকিকে।

তাঁর গলা শুনেই রকি শঙ্কিত গলায় বলল, "কী খবর কালীকাকা? বাবা ভাল আছে তো!"

"আছে রে আছে। ভালই আছে। তবে তোকে একটা ব্যাপারে একটু সাবধান করে দিতেই টেলিফোন করছি।'

"কী ব্যাপার কালীকাকা?"

"তই কিন্তু কিছুতেই, কোনওক্রমেই তোর বাবার সঙ্গে যোগাযোগ করিস না।"

"কেন কাকা? কী হয়েছে?"

"সব তো টেলিফোনে বলা যায় না। তবে আমার কথাটা শুনিস।"

রকি একটু চুপ করে থেকে বলে, "কিন্তু ..."

"কিন্তু কিসের?"

"আমি যে একটা অন্যায় করে ফেলেছি কাকা। বাবার জন্য মনটা সবসময়ে ভীষণ খারাপ লাগে। পৃথিবীতে আমার তো আপনজন বলতে বাবা আর আপনি। বাবাকে অনেকদিন দেখিনি, তাই তিন-চারদিন আগে হঠাৎ বাবাকে একটা চিঠি দিয়েছি।"

কালীপ্রসাদ আর্তনাদ করে উঠলেন,"সর্বনাশ!"

"কী হয়েছে আমাকে একটু বলবেন কাকা? চিঠিতে আমি বাবাকে শুধু জানিয়েছি যে, আমি বেঁচে আছি, ভালই আছি।"

“চিঠিতে তোর ঠিকানা দিয়েছিস?”

“দিয়েছি। আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে বাবার একটা কিছু হয়েছে। আমাকে বলবেন না?”

“অত বলার সময় নেই। তবে তো বাবার চেয়ে তোরই বিপদ এখন বেশি। শোন, কোনও ওজর-আপত্তি করিস না, তুই আজকেই এবং পারলে এখনই আমার কাছে চলে আয়। খবরদার, কোথায় যাচ্ছিস, কার কাছে যাচ্ছিস তা কাউকে জানাবি না। তোর বাবাকেও না। সোজা কালীপুরে চলে আসবি।”

রকি অবাক হয়ে বলে, “সে কী! আমার যে নতুন চাকরি, অনেক দায়িত্ব, কোম্পানি ছাড়বে কেন?”

“ওরে, যা বলছি শোন। চাকরি যদি যায় তো যাবে। তোর যা কোয়ালিফিকেশন তাতে ফের ভাল চাকরি পাবি। প্রাণের চেয়ে তো আর চাকরিটা বেশি নয়।”

“প্রাণ! প্রাণের কথা উঠছে কেন কাকা?”

“আগে আয়, তারপর ডিটেল্স শুনবি। কিন্তু একটা মুহূর্তও দেরি করিস না। তোর সত্যিই বিপদ। ডেল্টার নাম শুনেছিস?”

“শুনেছি। ডেল্টা তো খুব ডেঞ্জারাস অর্গানাইজেশন!”

“তোর পিছনে ডেল্টা লেগে গেছে। ব্যাপারটার গুরুত্ব বোঝানোর জন্য বললাম। চলে আয়।”

৪. পায়রাটা এল

পায়রাটা এল সকাল আটটা নাগাদ। বাবু মিত্তির তাঁর দোতলার বসবার ঘরে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। কিংবা পড়ার চেষ্টা করছিলেন। মন দিতে পারছিলেন না। আজকাল কোনও কিছুতেই মন দিতে পারেন না। বেজায় অন্যমনস্ক থাকেন। মনটা সবসময়ে কেবল ‘হায় হায়’ করে। অনেক টাকা করলেন, গাড়ি হল, বাড়ি হল, লোকে মান্যগণ্যও করে, কিন্তু সবই যেন ব্যর্থ হয়ে গেল নিজের স্বভাবদোষে। মৃত্যু চকিতে এসে দরজায় দাঁড়িয়েছে। ছেলেটার কোনও খোঁজ নেই। কালীপ্রসাদের ভৌতিক গল্পটা তাঁর পুরোপুরি বিশ্বাস হয় না বটে। তবু শেষ ভরসা হিসেবে নির্ভর করে আছেন। জঙ্গলে এক ভুতুড়ে গাঁয়ে বাস করে কালীপ্রসাদ, হয়তোবা সত্যিই সেখানে অলৌকিক কাণ্ডকারখানা হয়।

সর্বক্ষণ উৎকর্ণ থাকেন বলেই বোধ হয় পায়রার ডানার আওয়াজটা শুনতে পেলেন। তাড়াতাড়ি ছাদে উঠে এসে পায়রার পা থেকে চিরকুটটা পড়লেন। তাঁর বিছানায় রেডিয়ো-অ্যাকটিভ ছুঁচ আছে এটা কালীপুর গ্রামে বসে কালী প্রসাদ জানতে পারল কীভাবে?

বাবু মিত্তির তাড়াতাড়ি নেমে এসে শোওয়ার ঘরে ঢুকলেন। বিছানা পরিপাটি করে পাতা। ওপরে টান-টান বেডকভার। তিনি আগে বেডকভারটা তুলে দেখলেন। সাদা ধবধবে চাঁদর পাতা। ইস্তিরির দাগ এখনও রয়েছে। তার অর্থ চাঁদরটা আজ সকালেই পাতা হয়েছে। একটু নিচু হয়ে খুব মন দিয়ে চাঁদরটা লক্ষ করলেন বাবু মিত্তির। ছুঁচ থাকলেও ওপর থেকে বোঝা যাবে না। তিনি খুব সাবধানে চাঁদরটা তুললেন। ছুঁচটা দেখতে পেলেন মিনিটদুয়েকের চেষ্টায়। তিনি শুলে তাঁর কোমর যেখানে থাকবার কথা ঠিক সেখানে খুব বুদ্ধি করে তোশকে সেলাইয়ের মধ্যে ছুঁচটা গোঁজা রয়েছে।

কলিংবেল দিয়ে রাখালকে ডাকলেন। “সকালে বিছানা কে তুলেছে রে রাখাল?”

"আমিই তুলেছি।"

রাখাল একটু অবাক হয়ে বলে। "সকালে তুই ছাড়া আর কেউ শোওয়ার ঘরে ঢুকেছিল?"

"জমাদার বাথরুম ধোলাই করতে ঢুকেছিল। আর পোকামারা বাবুরা এসে স্প্রে করে গেছে।"

"পোকামারা বাবু, মানে পেস্ট কন্ট্রোল?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, তারাই।"

"আজ কি তাদের আসার কথা?"

"তা তো জানি না। মাসে একবার করে তো আসে।"

"কখন এসেছিল?"

"আপনি তখন বাগানে পায়চারি করছিলেন।"

"সে তো খুব সকালে। অত সকালে পেস্ট কন্ট্রোলের লোকেরা আসে নাকি? তোর সন্দেহ হয়নি?"

"সন্দেহ হয়নি, তবে তারা নিজেরাই বলল, আজ অনেক বাড়িতে যেতে হবে বলে তারা সকালেই বেরিয়ে পড়েছে।"

"তুই তাদের সঙ্গে ছিলি?"

"ছিলাম।"

"কিছু অস্বাভাবিক দেখিসনি?"

"না। তবে পাম্পার ফিট করতে গিয়ে একজনের হাত একটু কেটে গিয়েছিল বলে অ্যান্টিসেপটিক এনে দিয়েছিলাম।"

"তারা ক'জন ছিল?"

"চারজন।"

"চেনা লাগল?"

"না। প্রতি মাসে এক লোক আসে না।"

"একটা চিমটে আর একটা টিনের কৌটো দিয়ে যা। আর পলাশকে পাঠিয়ে দে। সে কী করছে?"

"সকালের জলখাবার খাচ্ছে।"

"খাওয়া হলে আসতে বলিস।" রাখাল চিমটে আর কৌটো দিয়ে গেলে বাবু মিত্তির দরজা বন্ধ করে ছুঁচটা সাবধানে ধরে কৌটোয় পুরলেন। তারপর তোশকসমেত চাঁদর আর বেডকভারটা মুড়ে রাখলেন। ধীরেসুস্থে ব্যবস্থা করতে হবে। নিজেকেই।

পলাশ যখন এল তখন কাজ শেষ করে তিনি বসবার ঘরে এসে বসেছেন।

পলাশ বলল, "ডাকছিলেন আমাকে?"

"হ্যাঁ। তুমি কি সায়েন্সের ছাত্র?"

"বি. এসসি. পাশ করেছিলাম।"

"রেডিয়ো অ্যাকটিভ কোনও জিনিসের সংস্পর্শে এলে কী হয় জানো?"

"ক্যানসার হয় বলে শুনেছি। কেন বলুন তো?"

"ঠিক জানো?"

"যদি বলেন তো ভাল করে খোঁজ নিয়ে বলতে পারি।"

"ভাল করেই খোঁজ নাও।"

"নেব।"

"আর-একটা কথা, যদি ক্যানসার হয় তবে কতদিনে সেটা বোঝা যাবে। সেটাও জেনে এসো।"

"হঠাৎ এসব বলছেন কেন?"

বাবু মিত্তির পলাশের দিকে তাকালেন। কালীপ্রসাদ তাঁকে যতদূর সম্ভব গোপনীয়তা রক্ষা করতে বলেছেন। সুতরাং ঘটনাটা একে বলা ঠিক হবে না। তিনি বললেন, "কাল তোমাকে বলব। আর-একটা কথা, আমাকে এখন সবসময়ে পাহারা দেওয়ার দরকার নেই।"

"কেন বলুন তো?"

"মনে হচ্ছে দরকার হবে না।"

"রাখাল বলছিল আপনার বিছানায় কিছু একটা হয়েছে। কাঁকড়াবিছে বা সাপটাপ গোছের কিছু? সকালে নাকি পেস্ট কন্ট্রোলের লোক এসেছিল, যাদের আপনি সন্দেহ করছেন?"

বাবু মিত্তির মুখটা নিরাসক্ত রাখবার প্রাণপণ চেষ্টা করে বললেন, "মেক্সিকোর কুখ্যাত কালো কাঁকড়াবিছে। আমি সেটাকে মেরে ফেলে দিয়েছি।"

পলাশ একটু বিবর্ণ হয়ে বলল, "ক'টা ছেড়ে গেছে তার ঠিক কী?"

“ভাল করে খুঁজে দেখেছি। ও-ঘরটা আজ অ্যাভয়েড করলেই হবে। রাম পহলওয়ানের খবর নিয়েছ?”

“নিয়েছি। পেট থেকে পাম্প করে বিষ বের করা হয়েছে। কিন্তু অবস্থা এখনও ভাল নয়। বাহাত্তর ঘণ্টা না কাটলে কিছু বলা যাবে না।”

“ডাক্তারদের বোলো তার চিকিৎসার ব্যাপারে যেন কোনও ত্রুটি না। হয়। টাকা যতই লাগুক।”

“সেটা ডাক্তাররা জানেন। চিকিৎসার ত্রুটি হচ্ছে না।”

“তুমি আজ একটু বেড়িয়েটেড়িয়ে এসো, মনটা ভাল থাকবে। আর সবসময়ে সাবধান থেকো।”

“আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই, কিছু মনে করবেন।”

“না, আমাকে সবই জিজ্ঞেস করতে পারো।”

“আপনাকে মারবার জন্য ডেল্টা যেরকম বিরাট প্ল্যানিং নিয়েছে তাতে মনে হচ্ছে তাদের ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই নয় কি? বিশেষ করে ঘটনা ঘটে যাওয়ার এত বছর পর।”

“ডেল্টা বিশ্বাসঘাতকদের কখনও ক্ষমা করে না।”

“সেটা বুঝলাম। সেক্ষেত্রে আপনাকে তারা আচমকা গুলি করে বা স্ট্যাব করে মেরে ফেলত। আগে থেকে চিঠি দিয়ে, আপনাকে সতর্ক হওয়ার সুযোগ দিয়ে তারপর মারত না। ব্যাপারটার মধ্যে একটু অস্বাভাবিকতা আছে। একটু যেন বাড়াবাড়িও।”

“আমারও তাই মনে হচ্ছে।”

“বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে তারা খুব ঝুঁকি নিচ্ছে। সাধারণত এইসব ভাড়াটে খুনি বা অপরাধীর দল এরকম করে না। আপনার বেলায় করছে কেন? আপনি কি ওদের কোনও গুরুতর গুপ্ত কথা জানেন?”

বাবু মিত্তির খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, “তুমি খুব বুদ্ধিমান। জীবনে উন্নতি করবে।”

“ওটা আমার কথার জবাব হল না কিন্তু।”

বাবু মিত্তির আবার কিছুক্ষণ চুপ করে শূন্য চোখে চেয়ে রইলেন। তারপর গলাখাঁকারি দিয়ে মৃদু স্বরে বললেন, “তা হলে বোসো। আমার আর লুকোবার কিছুই নেই। তুমি খুব ভাল ছেলে। তোমাকে বললে হয়তো আমার কর্মফল কিছুটা কাটবে।”

পলাশ বসল। বলল, “দাঁড়ান। কথাগুলো বলবার আগে ভাল করে ভেবে নিন, আমাকে বললে আপনার কোনও ক্ষতি হবে কি না।”

বাবু মিত্তির ম্লান হেসে বললেন, “ক্ষতির ভয় আর কিছু নেই। আমার জীবনটা তো পার করেই দিলাম। তোমার অনুমান খুব ভুল নয়। আমাকে মারার জন্য যে বিরাট জাল ফেলেছে ডেল্টা, তা অকারণ নয়। ঘটনার শুরু অলিম্পিকে। আমাকে সাহেবরা বলত কোব্রা। সেটা অকারণে বলত না। অলিম্পিকের আগেই বিভিন্ন আন্তজাতিক প্রতিযোগিতায় আমার রেকর্ড এত ভাল ছিল যা ভারতীয় বক্সারদের কেউ কখনও পারেনি। অলিম্পিকে সোনার মেডেল আমার বাঁধাই ছিল। আমার প্রতিদ্বন্দ্বীরা কেউই আমার সমকক্ষ ছিল না। প্রথম দুই রাউন্ড আমি জিতেছিলাম ফাস্ট রাউন্ড নক আউটে। পরেরগুলোও তাই জিততাম। সেই সময়ে অলিম্পিক ভিলেজে একদিন একজন লোক আমাকে এসে ধরল। সে বলল, অলিম্পিকের পর সে আমাকে আমেরিকায় নিয়ে গিয়ে প্রফেশন্যাল বক্সিং-এ নামাতে চায়। প্রফেশন্যাল বক্সিংয়ে আমেরিকা দুনিয়ার সেরা দেশ। লাখো লাখো ডলারও আয় করা যায়। আমি এ-প্রস্তাবে দারুণ নেচে উঠলাম। লোকটা আমাকে আগাম এক

হাজার ডলারও দিয়েছিল। থার্ড রাউন্ডে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল রাউল নামে দক্ষিণ আমেরিকার একটি ছেলে। ইজি অপোনেন্ট। কিন্তু সেই লোকটা বলল, লড়াইটা যদি ছেড়ে দিই তবে সে আমাকে আরও পাঁচ হাজার ডলার দেবে। শুনে আমি অবাক হলাম। কিন্তু রাজি হইনি।”

বাধা দিয়ে পলাশ বলল, “রাউল নামে একটি ছেলেই না মেক্সিকোর সেই ঘটনায় আপনার সঙ্গী ছিল।”

বাবু মিত্তির মৃদু হাসি হেসে বললেন, “তোমার স্মৃতিশক্তি চমৎকার। হ্যাঁ, এই সেই রাউল। তার সঙ্গে লড়াইয়ের দিনই আমি পেটের ব্যথায় কাতর হয়ে পড়ি। হাসপাতালেও যেতে হয়েছিল। কোনও বিষ কোনওভাবে আমার শরীরে কেউ ঢুকিয়ে দেয়। এতদিন ধরে ভেবে-ভেবেও আমি ষড়যন্ত্রটা ধরতে পারিনি। ঘটনাগুলোকে জুড়তেও পারিনি।”

“এখন কি পারছেন?”

“বোধ হয় পারছি। রাউল আমার বিরুদ্ধে ওয়াক ওভার পেয়ে সেমিফাইনালে যায়। কিন্তু সুবিধে করতে পারেনি। শেষ অবধি সে ব্রোঞ্জ মেডেল জিতেছিল। তবে ভিলেজেই সে এসে আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করে।”

“আর আমেরিকার সেই লোকটি?”

“সেই কথাতেই আসছি। বক্সিং কম্পিটিশন শেষ হওয়ার পরই আমার সঙ্গে তার দেখা করার কথা। তার নাম ছিল জন লিডো। অন্তত ওই নামটাই সে বলেছিল। কিন্তু লিডো আর আমার সঙ্গে দেখা করল না। একেবারে হাওয়া হয়ে গেল। অলিম্পিকের পর দেশে ফিরে আসি। কিছুদিন বাদেই রাউল একটা চিঠি লিখে আমাকে আর্জেন্টিনায় যেতে নেমন্তন্ন করে। আমি দেশে তখন খুব ভাল অবস্থায় নেই। বরাবরই আমার একটু বড়লোক হওয়ার নেশা। তা ছাড়া বিশ্ববিখ্যাত হওয়ার স্বপ্ন তো ছিলই। হাজার ডলার সম্বল করে আমি আবার ভেসে পড়লাম। আর্জেন্টিনায় রাউলের সঙ্গে দেখা হল। সে-ই আমাকে

পলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। তারপর থেকেই আমার জীবন অপরাধ জগতের সঙ্গে জড়িয়ে যায়। মেক্সিকোয় যে মিশনে রাউলের সঙ্গে আমাকে পাঠানো হয়েছিল সেটা ছিল বিপজ্জনক। কথা ছিল খুনের কাজটা আমিই করব। রাউল থাকবে আড়ালে। সে আমাকে পালাতে সাহায্য করবে। ফয়দাও ছিল আমারই বেশি। ওই একটা কাজের জন্যই আমাকে পাঁচ লাখ ডলার দেওয়ার কথা। হাতে-হাতে। মেক্সিকোর ৪৮

একটি হোটেলে টাকা নিয়ে অপেক্ষা করছিল ডলফিন নামে আর-একটা লোক। কাজ হাসিল করে গেলেই টাকা মিটিয়ে দেবে। কিন্তু ব্যাপারটা প্ল্যানমাফিক হল না। ওই পার্টিতে সাদা পোশাকে অনেক সিকিউরিটি গার্ড ছিল, যে-তথ্যটা আমাদের জানা ছিল না। আমাকে একটা ছোট্ট হাতবোমা দেওয়া হয়েছিল। একটা নৈনিতাল আলুর চেয়ে বেশি বড় নয়। কিন্তু খুব শক্তিশালী। কথা ছিল সবাই যখন সেই শিল্পপতির স্বাস্থ্যপান করবে সেই সময়ে বোমাটা টপকে দেওয়া। কেউ ধরতে পারত না আমাকে। বোমা ফাটলে সবাই বিভ্রান্ত হয়ে যেত।”

“আপনার কাছে কি অন্য কোনও অস্ত্র ছিল না?”

বাবু মিত্তির কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জামার তলায় হাত ভরে তাঁর পিস্তলটা বের করে আনলেন। বললেন, “এটা ছিল।”

পলাশ একটা শ্বাস ফেলে বলে, “এবার বলুন।”

বাবু মিত্তির পিস্তলটা আবার শোলডার হোলস্টারে ভরে রেখে বললেন, “তুমি সত্যিই বুদ্ধিমানগজপতি আমাকে ভুল লোক দেয়নি। যাই হোক, পার্টি যখন চলছিল তখন হঠাৎ রাউল দৃজন সিকিউরিটির হাতে ধরা পড়ে। কীভাবে পড়েছিল তা আমি জানি না। সেই বিশাল পার্টিতে সে আমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তবে একটা ঝটাপটি আর চেঁচামেচি শুনে আমি এগিয়ে গিয়ে দেখি, রাউলের সঙ্গে দুটো লোকের মারপিট হচ্ছে। রাউল অলিম্পিকের পদক পাওয়া বক্সার। তার সঙ্গে পেরে ওঠা চাট্টিখানি কথা নয়। সে

খুঁসি চালিয়ে দুজনকে হারিয়ে পালানোর চেষ্টা করতে যায়। সে-সময়ে সে পিস্তলও বের করে। আর তখনই গুলি চলে। আমি আর অপেক্ষা করিনি। কারণ যাকে মারব বলে যাওয়া সেই লোকটিকে চোখের পলকে সিকিউরিটি গার্ডরা ঘিরে ফেলে পার্টি থেকে সরিয়ে নিয়ে যায়। আমি গতিক সুবিধের নয় দেখে পালাই। কিন্তু তখন লোভ ছিল প্রচণ্ড। ভাবলাম এক ঢিলে দুই পাখি মারব। এই খুনখারাপির বিপজ্জনক কাজ আর করব না, আর নিজের আখেরটাও গুছিয়ে নেব। পার্টি থেকে বেরিয়ে এসে আমি আমাদের স্পোর্টস কারটি নিয়ে সোজা সেই হোটেলে গিয়ে হাজির হই। ডলফিন গম্ভীর মুখে অপেক্ষা করছিল তার ঘরে।

সঙ্গে মস্ত বড় অ্যাটাচি কেস। আমি গিয়ে সোজা তাকে বললাম, কাজ হাসিল, টাকা দাও। সে গম্ভীর মুখে বলল, রাউল কোথায়? আমি বললাম, সে পরে আসছে। একটু ঝামেলায় পড়েছে।"

বাবু মিত্তির চোখ বুজে যেন স্মৃতিটাকে আর একটু ঝালিয়ে নিলেন। তারপর বললেন, "কিন্তু ডলফিন বোকা নয়, সে যেন পচা ইঁদুরের গন্ধ পেয়ে নাক কুঁচকে বলল, রাউল আর তুমি একসঙ্গে না এলে টাকা দেওয়ার হুকুম নেই। অপেক্ষা করো, রাউলকে আসতে দাও। আমি রেগে গিয়ে বললাম, রাউল তার সময়মতো আসবে, আমি অপেক্ষা করব কেন? সে ঠাণ্ডা গলায় বলল, তুমি এখনও জানো না রাউল কে। জানলে ওকথা বলতে না। যে-টাকাটা তুমি আজ পাবে অন্য লোকে একাজের জন্য এর দশ ভাগের এক ভাগও পায় না। তুমি পাচ্ছ রাউলের দয়ায়।"

"আপনি তখন একথাটার অর্থ বুঝতে পারেননি?"

"না। তুমি কি পারছ?"

"মনে হয় পারছি।"

"আমি তো আগেই বলেছি তুমি বুদ্ধিমান ছেলে। আমি বুঝতে পারিনি, কারণ আমি তখন ভীষণ উত্তেজিত আর অস্থির। হাতে সময় নেই। যত তাড়াতাড়ি পালানো যায় ততই

মঙ্গল। ডলফিন আমার মুখ দেখে কিছু আন্দাজ করেছিল। সে এক হাতে হোলস্টার থেকে রিভলভার বের করতে করতে অন্য হাতে অ্যাটাচিটা চেপে ধরল। কিন্তু ডলফিন মাঝবয়সী মানুষ। গুণ্ডা হলেও আমার মতো চটপটে নয়, গায়ে তত জোরও নেই। আমি তাকে একটা ঘুসি মেরে শুইয়ে দিলাম আর হাত মুচড়ে রিভলভার আর অ্যাটাচি দুটোই কেড়ে নিলাম। ডলফিন মেঝেতে পড়ে গিয়েও আমার দিকে চেয়ে চিৎকার করে বলে উঠল, রাউল কোথায়? রাউলের যদি কিছু হয় তো তোমার রক্ষে নেই। অলিম্পিকে প্রাণে বেঁচে গেছ, এবার বাঁচবে না। পল তোমাকে শেষ করবেই।"

"আপনি তখনও বুঝতে পারেননি?"

"না। বোধ হয় তখন থেকেই আমার মাথায় কার্যকারণ অনুধাবন করার ক্ষমতা কমতে শুরু করে। তা ছাড়া টাকার লোভ, মৃত্যুভয়, পালানোর তাড়া, সব মিলিয়ে মাথার ঠিক ছিল না। আমি রিভলভারের বাঁট দিয়ে মেরে ডলফিনকে অজ্ঞান করে পালিয়ে যাই। অনেক কষ্ট করে, নানা ঘটনা ঘটিয়ে প্রথমে আফ্রিকা, তারপর দেশে ফিরে আসি।

"ঘটনাটা যদি আগে জানতাম তা হলে ডেল্টা আপনাকে কেন এভাবে মারতে চায় তা আগেই বুঝতে পারতাম।"

বাবু মিত্তির মৃদু হেসে বললেন, "বুঝতে পেরেছ তা হলে?"

"অনেকটা।"

"কী বুঝেছ বলো তো?" পলাশ গম্ভীর মুখে বলল, "রাউল আসলে পলের ছেলে, কিন্তু সেটা ওরা আপনাকে বুঝতে দেয়নি কখনও।"

"শাবাশ!" বলে বাবু মিত্তির হেসে উঠলেন।

"অলিম্পিকে আপনার হাত থেকে রাউলকে বাঁচানোর জন্য পলই তার লোককে লাগিয়েছিল। সেই লোকই আপনাকে আমেরিকায় নিয়ে যাওয়ার লোভ দেখায়।"

“বুস আই! চমৎকার।”

“সেই লোকটা যখন লড়াই ছেড়ে দেওয়ার জন্য আপনাকে পাঁচ হাজার ডলার দিতে চেয়েছিল তখন কি আপনার মনে হয়নি ও রাউলের লোক?”

বাবু মিত্তির মাথা নেড়ে বললেন, “না, মনে হয়নি। তার একটা সঙ্গত কারণ আছে। বিশ্ব পর্যায়ের যে-কোনও প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিয়েই একটা বাজি ধরাধরি হয়। অনেক টাকার খেলা। কোনও একজন বক্সারের ওপর কেউ হয়তো এক লাখ ডলার বাজি ধরল। তখন বাজি জেতবার জন্য সে প্রতিদ্বন্দ্বী বক্সারকে পাঁচ-দশ হাজার ডলার দিয়ে হেরে যেতে রাজি করিয়ে নেয়। এ-জিনিস আকছার হচ্ছে। কাজেই রাউলকে সন্দেহ

করার কিছু ছিল না।”

“সেই লোকটাই কি আপনাকে বিষ দিয়েছিল?”

বাবু মিত্তির মাথা নেড়ে বললেন, “না। পলের অনেক লোক ছিল। অলিম্পিক ভিলেজে আমি রোজ সকালে সেন্ট্রাল ডাইনিং হল-এ গিয়ে ব্রেকফাস্ট করতাম। আমার মনে হয় সেই সময়ে আমার দুধে কেউ কিছু মিশিয়ে দেয়। ওকাজটা খুব শক্ত ছিল না।”

“এবার ব্যাখ্যাটা আপনিই করুন।”

“ব্যাখ্যা খুব সোজা। আমি বোকা বলেই এতদিন বুঝতে পারিনি। সবচেয়ে করুণ ব্যাপারটা কী জানো? সেটা হল রাউল। সে হয়তো বড় বক্সার ছিল না, কিন্তু হৃদয়বান ছিল। আমাকে সোনার মেডেল থেকে তার বাবা বঞ্চিত করেছে এটা সে কখনওই ভোলেনি। তাই নানাভাবে ক্ষতিপূরণ করতে চেয়েছে। আর্জেন্টিনায় নেমন্তন্ন করা, বাপের দলে ভেড়ানো, বেশি-বেশি বখরা পাইয়ে দেওয়ার চেষ্টা, এ-সবই তার ভালবাসার নিদর্শন।”

"কিন্তু ..."।

"হ্যাঁ, ওই কিন্তুটার কথাই আসল কথা। রাউল আমাকে ভালবেসেছিল ঠিকই, কিন্তু একটা পাপচক্রে ভিড়িয়ে আমার জীবনটাও সে নষ্ট করতে বসেছিল। অবশ্য তাকে দোষ দিই না। সে ছেলেবেলা থেকেই হয়তো ওসবে অভ্যস্ত। কাজেই খুন, ড্রাগের ব্যবসা বা চোরাচালানকে খারাপ বলে ভাবতেই শেখেনি।"

"এবার আসল কথাটায় আসুন কাকাবাবু। পল আপনাকে মারার জন্য এই বিরাট প্ল্যানিং কেন করছে?"

বাবু মিত্তির একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "অনেকের সন্দেহ। রাউলকে আসলে খুন করেছিলাম আমি।"

"আপনি! আপনি কেন খুন করবেন?"

"মেক্সিকো থেকে পালিয়ে আসার আগে আমাকে কিছুদিন গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে হয়েছিল। আমার এক বিশ্বস্ত কালো বন্ধু ছিল, তার বাড়িতে। সে আমাকে বলেছিল, শহরে জোর গুজব যে, রাউলকে খুন করেছে বাবু। কারণ রাউলের জন্যই সে অলিম্পিকে সোনার মেডেল পায়নি। তা ছাড়া রাউল যে-গুলিতে মারা যায় তাও ছিল নাইন মিলিমিটারের এই পিস্তলের।"

"রাউলকৈ আপনি সত্যিই মারেননি তো কাকাবাবু?"

"না পলাশ। রাউল আমার বন্ধু ছিল। ষড়যন্ত্রটার কথা তখনও আমার জানা ছিল না। অনেক পাপ করেছি বটে, তবে এ পাপটা করিনি।"

"পলের বয়স এখন কত হবে কাকাবাবু?"

"হয়তো সত্তর বা সামান্য বেশি। পুত্রশোক সে আজও ভোলেনি। তার প্রতিশোধস্পৃহা ভয়ঙ্কর।"

"বুঝতে পারছি। অ্যাটাচি কেস-এ আপনি কত ডলার পেয়েছিলেন?"

"শুনে কী করবে? তবে বলতে বাধাও নেই। আমার পাঁচ লক্ষ ডলার ছাড়াও এতে ছিল আরও পাঁচ লক্ষ। বাড়তি পাঁচ লক্ষ হয়তো অন্য কোনও পে-অফ-এর জন্য ছিল। মোট এক মিলিয়ন ডলার। মিলিয়নের বাংলা কী বলল তো!"

"নিযুত।"

"হ্যাঁ, এক নিযুত ডলার। ও-টাকা পলের কাছে কিছুই নয়। কিন্তু আমার কাছে অনেক টাকা।"

পলাশ একটু হেসে বলল, "আপনি আজ অনেক কথা আমাকে অকপটে বললেন, তবু কিছু গোপনও করছেন। রেডিয়ো অ্যাকটিভিটি, ক্যানসার ইত্যাদি নিয়ে আপনার প্রশ্ন আসছে কেন?"

বাবু মিত্তির নির্বিকার মুখে বললেন, "হতে পারে তারা আমাকে বায়োলজিক্যাল অ্যাটাক করতে চাইছে। সব দিক দিয়ে চিন্তা করছি।"

"কাকাবাবু, কাঁকড়াবিছের গল্পটা কি সত্যি?" বাবু মিত্তির হাসলেন, "সত্যি না হলেও সত্যি বলেই ধরে নাও। আর কিছু জিজ্ঞেস কোরো না।"

"ঠিক আছে।" বলে পলাশ চলে গেল।

বাবু মিত্তির একটু স্বস্তি বোধ করছেন। ডেল্টা তাঁকে ক্যানসার উপহার পাঠিয়েছে। সুতরাং তারা এখন অপেক্ষা করবে। লক্ষ্য রাখবে। তাদের প্ল্যান যে ভেস্তে গেছে সেটা না জানা

অবধি তারা হয়তো আর কিছু করবে না। সুতরাং টান-টান দুশ্চিন্তা নিয়ে থাকার দরকার নেই।

সারাদিন বাবু মিত্তির আজ একটু হালকা মেজাজে রইলেন। তাঁর বক্সিংয়ের ছাত্ররা এলে আজ তিনি নিজে তাঁদের সঙ্গে অনেকক্ষণ স্পারিং করলেন। শরীরটা অনেক ঝরঝরে লাগল। দুপুরে আজ তৃপ্তি করে খেলেনও।

খেয়ে উঠে কালীপ্রসাদকে একটা চিঠি লিখলেন, "কালী, তুই কি পিশাচসিদ্ধ, নাকি সত্যিই তন্ত্রমন্ত্র জানিস, নাকি সত্যিই তোর পোষা ভূত আছে? অত দূর থেকে কি করে ছুঁচের কথা টের পেলি? ছুঁচ সত্যিই ছিল। আজ সকালেই ডেল্টা মৃত্যুবাণটি আমাকে উপহার পাঠিয়েছে। তোর জন্যই বেঁচে গেলাম। কিন্তু দৈবের ওপর নির্ভর করে কতবার বাঁচা যাবে? আমি পাপী লোক, ঈশ্বর আমার জন্য বেশি মাথা ঘামাবেন বলে আমার মনে হয় না। সবচেয়ে বড় প্রয়োজন এখন রকিকে, তোর কাছে একটু আশার আলো দেখেছিলাম। তার কোনও খবরই তো আর দিলি না! তোর আশায় বসে আছি। "

ছাদে উঠে পায়রাটির পায়ে চিরকুট বেঁধে উড়িয়ে দিলেন। বিকেলে বাগানে কাজ করার অছিলায় একটা কামিনীঝোঁপের পিছনে ঘের-পাঁচিলের কাছ ঘেঁষে খুরপি দিয়ে মাটিতে একটা গর্ত খুঁড়লেন। তারপর চারদিক ভাল করে দেখে নিয়ে কৌটোসমেত ছুঁচটিকে কবরস্থ করলেন তার মধ্যে।

শোওয়ার ঘরের তোশকটাকে বর্জন করা উচিত। কিন্তু সেটা করতে গেলে পাঁচজনের চোখে পড়ার সম্ভাবনা। ডেল্টার চোখ কতখানি খর নজর রাখছে তাঁর ওপর তা তো তিনি জানেন। সুতরাং ঘরে এসে বিছানাটি নিজেই পরিপাটি করে পাতলেন। স্থির করলেন, রাতে

মেঝেতে আলাদা একটা বিছানা পেতে শোবেন।

দিন দুই বেশ ঘটনাবিহীন কাটল। দুদিন বাদে সকালে হঠাৎ পলাশ একটু উত্তেজিতভাবে তাঁর ঘরে এসে ঢুকল। হাতে একটা চিঠি। বলল, "কাকাবাবু, আপনার ছেলের নাম তো রকি!"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। কেন বলো তো!"

"এ-চিঠিটা দেখুন তো, তারই কিনা।"

খামটা হাতে নিয়ে উত্তেজনায় কাঁপতে লাগলেন বাবু মিত্তির। খামের ওপরেই বাঁ দিকে নিজের নাম ও ঠিকানা লিখে দিয়েছে রকি। রকি বেঁচে আছে এইটেই অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছিল তাঁর কাছে।

খামটা খুলতে যাচ্ছিলেন, পলাশ বাধা দিয়ে বলল, "একটু দাঁড়ান কাকাবাবু, খামটা একটু লক্ষ করুন।"

"খামটা! কেন, কী লক্ষ করব?"

"খামটা ভোলা হয়েছে, তারপর বন্ধ করা হয়েছে। ফ্ল্যাপটা একটু ছেঁড়া।"

বাবু মিত্তির এই সময়ে পলাশের ডিটেকটিভগিরি মোটেই পছন্দ করলেন না। বললেন, "দাঁড়াও বাপু, আগে চিঠিটা দেখি। এ চিঠির মতো বড় সম্পদ এখন আর আমার কিছু নেই।"

এই বলে বাবু মিত্তির খামের মুখটা খুলে চিঠিটা বের করলেন। বেশ ছোট চিঠি। রকি লিখেছে :

শ্রীচরণেষু বাবা,

তোমার কাছে আমার অনেক অপরাধ জমা হয়েছে। তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি। হয়তো আমার জন্য তোমার কষ্টও হয়েছে খুব। আজ তোমাকে জানাতে আপত্তি নেই, আমি বাড়ি

থেকে পালিয়ে কালীপুরে কালীকাকার কাছে চলে গিয়েছিলাম। কালীকাকা এক অসাধারণ মানুষ। তিনি আমাকে দিল্লিতে পাঠিয়ে পড়াশোনা করান। আমি আমেরিকা থেকে ইলেকট্রনিক্স এঞ্জিনিয়ারিং-এ ডক্টরেট করে এসেছি। খুব শিগগিরই আমি তোমার কাছে যাব। তোমার জন্য আমার বড় মন কেমন করে। আমার সব অপরাধ ক্ষমা করে দিয়ে। দেখা হলে সব তোমাকে বলব। আমি বেঁচে আছি, ভাল আছি। চিন্তা কোরো না। প্রণাম নও।

–তোমার অবাধ্য ছেলে রকি।

নিজের অজান্তেই বাবু মিত্তিরের চোখ থেকে অজস্রধারে আনন্দাশ্রু বয়ে যাচ্ছিল। তিনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। নিষ্ঠুর মুষ্টিযোদ্ধার বুকের ভেতরে যে এত চোখের জল ছিল তা কে জানত!

সামলে উঠতে তাঁর মিনিটদশেকের মতো সময় লাগল। ততক্ষণে পলাশ একটাও কথা বলল না। বাবু মিত্তির শান্ত হওয়ার পর সে নরম

গলায় বলল, "কাকাবাবু, ঘটনাটা যেমন আনন্দের, তেমনই উদ্বেগেরও।"

বাবু মিত্তির অবাক হয়ে বললেন, "ওকথা কেন বলছ? কতদিন পর আমি আমার হারানো ছেলের খবর পেলাম!"

"সেটা না পেলেই বোধ হয় ভাল ছিল।"

"তার মানে?"

"আপনি যেমন রকি খবর পেলেন, তেমনই খবরটা পেয়ে গেল ডেল্টাও।"

বাবু মিত্তিরের হঠাৎ যেন চৈতন্য হল, "কী করে বুঝলে?"

"বোঝা খুব সহজ। খামের মুখটা খুলে আবার আঁটা হয়েছে, ভাল করে দেখলেই বুঝতে পারবেন।"

বাবু মিত্তির খামটা তুলে নিয়ে দেখলেন, সত্যিই ফ্ল্যাপটা একটু ছেঁড়া, আঠার একটা দাগ রয়েছে।

"আরও একটা কথা।"

"কী কথা পলাশ?"

"চিঠিটা এসেছে আজ সকালে। কিন্তু এ-সময়ে কখনও ডাকপিয়ন আসে না। আসে দুপুরে এবং কখনও-সখনও বিকেলেও। খামের ওপর মোহরের ছাপ দেখুন। অস্পষ্ট হলেও বোঝা যায়, চিঠিটার আসল ডেলিভারির তারিখ ছিল গতকাল। তার মানে চিঠিটা একদিন কারও কাছে ছিল। আজ সকালে আপনার চিঠির বাক্সে ফেলে গেছে।"

বাবু মিত্তির সবই বুঝলেন। ফ্যাকাসে মুখে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে তিনি তাড়াতাড়ি টেলিফোন তুলে আমেদাবাদে রকির নম্বর ডায়াল করলেন। একটা মোটা গলা ইংরেজিতে বলল, "ওয়েস্টার্ন ইলেকট্রনিক্স।"

বাবু মিত্তির রকির নাম বললেন। অপারেটর একটা কানেকশন দিল। দ্বিতীয় আর-একজন তোক ধরতেই বাবু মিত্তির নিজের পরিচয় দিয়ে রকির সঙ্গে কথা বলতে চাইলেন। লোকটা বলল, "সে তো দুদিন হল নিপাত্তা। কোনও খবর নেই। তার বাড়িতেও একটা হামলা হয়ে গেছে কাল রাতে।"

বাবু মিত্তির ফোন রেখে অবসন্নভাবে চোখ বুজলেন। এবার আনন্দাশ্রুর বদলে তাঁর দু চোখ থেকে শোকের জলধারা নেমে এল। ফিসফিস করে বললেন, "ঠিকই বলেছ পলাশ। চিঠিটা রকি না লিখলেই বোধ হয় ভাল করত।"

৫. কালীপ্রসাদ যে আজেবাজে

কালীপ্রসাদ যে আজেবাজে কথা বলার মানুষ নন তা রকি ভালই। জানে। তবে বয়সে মাথার গণ্ডগোল দেখা দিলে অন্য কথা। সাতপাঁচ ভেবে রকি কালীকাকার কথা অমান্য করল না। টেলিফোন পাওয়ার ঘণ্টাখানেকের মধ্যে প্লেনে সিট বুক করল এবং পরদিন বিকেলেই দিল্লি পৌঁছে তার পরদিন সকালের ফ্লাইট ধরে কলকাতায় চলে এল। কালীপুর পৌঁছতে অবশ্য বেলা গড়িয়ে গেল। নৌকো থেকে নেমে যখন ঘাটে উঠছে তখন ঘাটেই কালীপ্রসাদের সঙ্গে দেখা। নিতাই মাঝির ঝোঁপড়ায় উদ্বিগ্ন মুখে বসে ছিলেন। রকিকে দেখে লাফিয়ে উঠলেন, "এসেছিস!" বলে কালীকাকা একেবারে বুকে জড়িয়ে ধরলেন আনন্দে।

রকি মৃদু হেসে বলল, "আপনি কি সারাদিন এখানে বসে আছেন নাকি আমার জন্য?"

"বেলা ন'টা থেকে বসে আছি। গতকালও ছিলাম। রাতে ঘুমোতে পারিনি। "

"কিন্তু ব্যাপারটা কী কালীকাকা?"

"আগে বাড়ি চল, তারপর বলব।"

রকি স্নান করে ভাত খাওয়ার পর কালী প্রসাদ তার কাছে প্রায় সবই খুলে বললেন। বাবু মিত্তির যে একসময়ে ডেল্টার হয়ে কাজ করেছেন এবং কিছু-কিছু অত্যন্ত অন্যায় কাজও করেছেন, তাও রেখেঢেকে বললেন।

রকির মুখ শুকিয়ে গেল। সে বলল, "বাবার মুখে তো কখনও এসব শুনিনি। আমেরিকায় যখন ছিলাম তখন ডেল্টার কথা অনেক শুনেছি, খবরের কাগজেও পড়েছি। ওদের ভয়ে সবাই তটস্থ। ওরা যদি বাবার ক্ষতি করতে চায় তা হলে তো ভয়ের কথা।"

"শুধু তোর বাবা তো নয়, এখন তাদের নজর তোর ওপরেও পড়েছে বলে আমার বিশ্বাস। এতদিন ডেল্টা তোর খবর জানত না। কিন্তু বাবু মিত্তিরের কাছে তুই চিঠি লেখার পর তারা সব জেনে গেছে। এখন বাবুকে শাস্তি দেওয়ার জন্য ডেল্টা আগে তোকে মারবার চেষ্টা করবে।"

রকি কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে বলল, "দাঁড়ান, সত্যিই ডেল্টা আমার ওপর অ্যাটেম্পট করেছে কিনা তা এখনই খবর নিচ্ছি।"

রকি তার সুটকেস খুলে একটি অত্যাধুনিক খুদে যন্ত্র বের করল। তারপর কিছুক্ষণের চেষ্টায় আমেদাবাদে নিজের অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করল। কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলার পর সে গম্ভীর মুখে যন্ত্রটা ফের গুছিয়ে রাখতে রাখতে বলল, "আপনার কথাই ঠিক। আমি যে-ফ্ল্যাটটায় থাকি সেখানে দরজা ভেঙে কারা ঢুকেছিল। ফ্ল্যাট তছনছ করে গেছে। আমার বাড়িওয়ালা পুলিশে আর আমার অফিসে খবর দিয়েছে। ডেল্টার নেটওয়ার্ক তো দেখছি দারুণ ভাল।"

কালী প্রসাদ গম্ভীর মুখে বললেন, "এখন একটাই দুশ্চিন্তা, ওরা তোকে খুঁজতে খুঁজতে এত দূরেও হানা দেবে কিনা। দিলেই বা আমরা কী করতে পারি।"

রকি মৃদুস্বরে বলে, "কাকা, আমি বক্সার হতে পারিনি ঠিকই, কিন্তু আমি তো আমার বাবারই ছেলে। অত সহজে ভয় পাই না। আপনি অত দুশ্চিন্তা করবেন না। আমাদের মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। আচ্ছা, বাবা কি ব্যাপারটা পুলিশকে জানিয়েছেন?"

"তা জানি না। তবে পুলিশকে জানালে তেমন কোনও লাভ হবে বলে তো মনে হয় না।"

"তবু জানিয়ে রাখাটা ভাল।"

কালীপ্রসাদ দুঃখিত গলায় বললেন, "আমাদের দেশের পুলিশ তো কোন ছার, বাবুর কাছে শুনেছি, সে-দেশের পুলিশই তাদের কিছু করতে পারে না। তার ওপর পুলিশ

ডাকলে পুলিশেরই ভেক ধরে তারা বাড়িতে ঢোকার সুযোগ পাবে। অবশ্য সুযোগের অভাব তাদের নেই, রেডিয়ো অ্যাকটিভ ছুঁচ তো দিব্যি অনায়াসে বিছানায় ঢুকিয়ে দিয়ে গেল।”

রকি দমে গেল। বলল, “তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু এখন কী করা যাবে কাকা?”

“তোকে কিছু করতে হবে না। তুই শুধু চুপচাপ একটু গা-ঢাকা দিয়ে থাকবি। তোর একটা ওয়্যারলেস যন্ত্র আছে দেখছি। আগেই বলে রাখি, ওটা দিয়ে আবার ফস করে তোর বাবার সঙ্গে যোগাযোগ করে ফেলিস না।”

“না কাকা, আমি আর বোকামি করব না।”

নির্জন কালীপুরে ধীরে ধীরে বিকেল নেমে এল। তারপর সন্ধে হল। কালীমন্দিরে আরতি শুরু হল।

কালীপ্রসাদ তাঁর রান্নার ঠাকুর যোগেন আর কাজের লোক ধানুকে ডাকলেন। ল্যাবরেটরিতে তাদের দুজনকে বসিয়ে পরিস্থিতি সম্পর্কে খুব হুঁশিয়ার করে দিয়ে বললেন, “তোমরা দুজন আমার বিশ্বাসী লোক। সাহসীও। যদি ভয় পাও তা হলে তোমরা কিছুদিনের জন্য দেশে চলে যেতে পারো। আর যদি থাকতে চাও তা হলে বিপদের ঝুঁকি নিয়েই থাকতে হবে। এখন যা তোমাদের ইচ্ছা।”

ধানু মূকবধির হলেও কালীপ্রসাদের ঠোঁটের দিকে চেয়ে সব কথা বুঝতে পারে। সে মস্ত জোয়ান মানুষ। যে-কাজে গায়ের জোর লাগে সেকাজে তার খুব আনন্দ। সে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে বুকে দুটো থাবড়া মেরে জানিয়ে দিল সে থাকবে।

যোগেন একটু বয়স্ক মৈথিলী ব্রাহ্মণ। খুব শান্ত, ধীর-স্থির। বুদ্ধিও রাখে। সে বলল, “কোনও চিন্তা নেই কালীবাবা। আমিও থাকছি।”

কালীপ্রসাদ জানতেন যে, তাঁর বিশ্বস্ত দুই অনুচর কোনও বিপদেই। তাঁকে ফেলে যাবে না। বললেন, "ঠিক আছে। এখন বাড়িতে কোথা দিয়ে শত্রু ঢুকতে পারে তা একটু খুঁজে দেখ। পিছনের দেওয়াল খানিকটা ভাঙা আছে। ওদিকটায় একটু কাঁটাতার লাগালে ভাল হয়। ফটকটাতেও মরচে ধরেছে।"

যোগেন একটু ইতস্তত করছিল। যেন কিছু একটা বলতে চায়। খুব মৃদু একটু গলাখাঁকারি দিয়ে বলল, "বাড়িতে নিশুত রাতে নানারকম শব্দ হচ্ছে। আগে হত না। তিন-চারদিন ধরে শুনতে পাচ্ছি।"

কালীপ্রসাদ সচকিত হয়ে বলেন, "কীরকম শব্দ?"

"কেউ যেন চলাফেরা করে।"

"আগে বলিসনি কেন?"

"বললে তো আপনি হেসে উড়িয়ে দেবেন। এ বাড়িতে মানুষ ঢোকে, প্রেতাত্মারাই ঘুরে বেড়ায় হয়তো।"

কালীপ্রসাদ একটু চুপ করে থেকে বললেন, "সাবধান থাকি, এখন যা।"

রাতে আজ একটু তাড়াতাড়িই খাওয়া সেরে রকি তার ঘরে শুতে চলে গেল। পথশ্রমে ক্লান্ত সে। কালীপ্রসাদ একা নানা ভাবনা-চিন্তা নিয়ে ল্যাবরেটরিতে বসে লেখালেখি করতে লাগলেন। সময়ের জ্ঞান ছিল না। কিন্তু হঠাৎ একটা চেনা বোঁটকা গন্ধ পেয়ে ঘন-ঘন বাতাস শুকলেন। কালীপ্রসাদ সুন্দরবনের মানুষ। সবই তাঁর নখদর্পণে। জঙ্গলে ঘুরে-ঘুরে তাঁর বিপুল অভিজ্ঞতা হয়েছে। উপরন্তু তিনি নিজেই একসময়ে বাঘ পুষতেন। সেই বাঘের নামই দিয়েছিলেন 'হালুম। কুকুরের মতোই পোষ মেনে গিয়েছিল। আট বছর বয়সে সে হয়ে উঠেছিল পেল্লায় চেহারার। সেই সময়ে বিষাক্ত সাপের কামড়ে সে মারা যায়। আজও সেই শোক ভুলতে পারেন না কালীপ্রসাদ।

গন্ধটা যে নির্ভুল কোনও বাঘবাবাজির গায়ের গন্ধ, তাতে কোনও ভুল নেই। কিন্তু বাঘ এলে জানান পড়ে যায়। কালীপুর সুন্দরবনের প্রত্যন্ত প্রদেশে হলেও বাঘের জঙ্গল এখন দূরে সরে গেছে। এ-অঞ্চলে গত পাঁচ-সাত বছরে বাঘের আনাগোনা নেই। তবে বাঘ এল কোথা থেকে?

কালীপ্রসাদ চুপিসারে উঠলেন। নিঃশব্দে প্রথমে পুবের জানালার কাছে এসে খুব আস্তে পাল্লা ফাঁক করলেন। এদিকে গন্ধটা তেমন তীব্র নয়। জানালা বন্ধ করে উত্তরদিকের জানালায় গিয়েও পরীক্ষা করলেন। এদিকে গন্ধ আরও কম। এবার ধীরে ধীরে গিয়ে দক্ষিণের জানালাটা একটু ফাঁক করতেই ভক করে গন্ধটা যেন নাকে ধাক্কা মারল। বাইরে ঘন কুয়াশা। খুব ঠাণ্ডা। গাছের পাতায় শিশির পড়ার শব্দ হচ্ছে টুপটাপ। অন্ধকারে আর কিছু দেখা গেল না।

কালীপ্রসাদ ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়ে আবার দক্ষিণের জানালায় এসে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ চোখে বাইরে চেয়ে রইলেন। অজ পাড়াগাঁয়ে থাকেন বলেই কালীপ্রসাদের চোখের দৃষ্টি খুব তীক্ষ্ণ। চট করে অন্ধকার সয়ে যায়। অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে তিনি বাগানের গাছপালা, ঝোঁপঝাড় সবই চিনতে পারছিলেন। কোথাও কোনও নড়াচড়া বা শব্দ নেই। ধৈর্য হারালেন না। বাঘ অতিশয় চতুর জন্তু। চট করে ধরা দেয় না। পনেরো মিনিট থেকে আধঘণ্টা চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকার পর তিনি হঠাৎ শক্ত হয়ে গেলেন। সামনেই মল্লিকার ঝাড়। পর-পর অনেক গাছ। তারই ভিতর থেকে খুব ধীরে ধীরে একটা মস্ত ছায়ামূর্তির মতো বাঘটা উঠে দাঁড়াল। বেশ আলস্যজড়িত ভাবভঙ্গি। একবার যেন মুখটা ঘোরালো জানালার দিকে, যেখানে কালীপ্রসাদ দাঁড়িয়ে আছে। দুখানা জ্বলন্ত চোখ অন্ধকারে ধকধক করে উঠল। বুকটা কেঁপে গেল কালীপ্রসাদের। বাঘটা একবারই দৃষ্টিক্ষেপ করে দুলকি চালে ধীর গতিতে আরও দক্ষিণের দিকে চলে গেল।

কালীপ্রসাদ দুশ্চিন্তায় পড়লেন। গাঁয়ে বাঘ আসাটা খুব সুখের ব্যাপার নয়। সুন্দরবনের সব বাঘই মানুষখেকো। বাঘের খবরটা জানান দেওয়া দরকার। ছাদে উঠে ক্যানেস্তারা পেটালে গাঁয়ের লোক সতর্ক হয়ে যাবে।

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

কালীপ্রসাদ উঠতে যাচ্ছিলেন। টেবিলে রাখা ট্রানজিস্টার রেডিয়োতে স্ট্যাটিকের মৃদু শব্দ পেয়ে থামলেন। রেডিয়োর খবর শোনাটা তাঁর নেশার মতো। গানটানও শোনেন। রেডিয়োটা খুলে রেখেই কাজ করছিলেন। হয়তো অন্যমনস্ক ছিলেন বলে বন্ধ করতে ভুলে গেছেন। রেডিয়োটা বন্ধ করতে নবের দিকে হাত বাড়াতেই শুনতে পেলেন, "দিস ইজ অল ইন্ডিয়া রেডিয়ো... ওহে কালীপ্রসাদ, ক্যানেস্তারা পেটানোর দরকার নেই।"

ভয়ে হিম হয়ে গেলেন কালীপ্রসাদ। রেডিয়ো থেকে এ কার গলা শুনছেন তিনি? এ কি তারাপ্রসাদ নাকি?

রেডিয়ো আর কিছু বলল না। নব ঘোরাতে গিয়ে বুঝলেন, রেডিয়ো বন্ধই ছিল।

সভয়ে কালীপ্রসাদ তারাপ্রসাদের উদ্দেশে হাতজোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বললেন, "তাই হবে।"

কালীপ্রসাদ দোতলায় নিজের ঘরে এসে চটপট শুয়ে পড়লেন। শরীর শীতে আর ভয়ে কাঁপছিল। তবে ঘুমিয়ে পড়তেও দেরি হল না।

সকালবেলায় উঠে একগাছা মজবুত পাকা বাঁশের লাঠি হাতে বাগানটা তন্ন-তন্ন করে খুঁজে দেখলেন কালীপ্রসাদ। কোথাও বাঘের চিহ্নমাত্র নেই। যোগেনকে গাঁয়ে পাঠালেন বাঘ কোনও মানুষ বা গোরু-ছাগল নিয়ে গেছে কি না। যোগেন এসে বলল, "কোনও ঘটনা ঘটেনি। তবে বুড়ো তারিণীখুড়ো বাঘের গন্ধ পেয়েছেন। শাকিলের গোয়ালে গোরুরা খুব দাপাদাপি করেছে রাতে। তার বেশি কিছু নয়।"

তারপর পায়রা-দূত মারফত একটা খবর পাঠালেন বাবু মিত্তিরকে, "চিন্তা করিস না। বিপদে পড়লে কালীপুরে চলে আসিস। মরলে সবাই একসঙ্গে মরব। কালীপুর অপেক্ষাকৃত নিরাপদ জায়গা। অচেনা লোক এলে জানাজানি হয়ে যায়। কলকাতায় তো সেই সুবিধেই নেই।"

কালীপ্রসাদের খুব ইচ্ছে, পুত্র-বিরহে কাতর বাবু মিত্তিরের সঙ্গে রকির দেখা-সাক্ষাৎটা এখানেই হোক, তাঁর চোখের সামনে।

এর পর রকিকে খুঁজতে গিয়ে কালীপ্রসাদ দেখেন, সে ঘরে নেই। বিছানা পরিপাটি করে তোলা। বাথরুমে নেই। কোথাও নেই। কালীপ্রসাদ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। রকি গেল কোথায়?

যোগেনকে ডেকে জিজ্ঞেস করতে যোগেন বলল, "দাদাবাবু তো হাফপ্যান্ট আর গেঞ্জি পরে খুব ভোরবেলা দৌড়তে বেরোলেন।"

কালীপ্রসাদের দুশ্চিন্তা তবু রয়ে গেল। রকির বয়স কম, অভিজ্ঞতা কম। হুট করে বেরিয়ে পড়েছে, বিপদের কথাটা মাথায় না রেখেই। কালীপ্রসাদ উদ্বেগে বেরিয়ে পড়লেন। হাটখোলা, কালীমন্দির, মালোপাড়া ঘুরে কোথাও পেলেন না রকিকে। দু-চারজনকে জিজ্ঞেস করলেন। কেউ দেখেনি তাকে। হতাশ কালীপ্রসাদ ঘাটের কাছে চারদিক দেখলেন। কোথাও নেই। খোঁজ নিয়ে জানলেন, নৌকো করেও ওরকম কেউ আজ কোথাও যায়নি।

ফিরে আসছেন, হঠাৎ অদৃশ্য জায়গা থেকে কেউ ডাকল, "কালীকাকা!"।

কালীপ্রসাদ চারদিকে চেয়ে দেখলেন। প্রথমটায় কাউকে দেখতে পেলেন না। খালের ধারে একটু উত্তর দিকে পাণ্ডুরাজার বিশাল ঢিবি। জঙ্গলে একেবারে দুর্গম হয়ে আছে। পাণ্ডুরাজার ঢিবি নামটা গ্রামবাসীদেরই দেওয়া। এখানে কখনও ও-নামে কেউ রাজত্ব করেছিল বলে জানা নেই তাঁর। তবে ঢিবির মধ্যে কোনও ধ্বংসাবশেষ থাকলেও থাকতে পারে। ডাকটা, মনে হল, ওদিক থেকেই এল। কালীপ্রসাদ

একটু এগিয়ে গিয়ে অনুচ্চ গলায় ডাকলেন, "রকি নাকি রে?"

ঢিবির ওপরে ঝাঁকড়াঝাঁকড়া ঝোঁপঝাড়। তার ভেতর থেকে টুপি মাথায় একটা মূর্তি উঁকি দিল। মুখে একগাল হাসি। রকি।

কালীপ্রসাদ আর্তনাদ করে উঠলেন, "ওখানে কী করছিস? সাপখোপের আস্তানা, বিছুটি গাছ, ভীমরুলের চাক, কী নেই ওখানে?"

রকি তার গলায় ঝোলানো একটা বাইনোকুলার তুলে দেখিয়ে বলল, "ওয়াচ করছি।"

"ওয়াচ করতে হবে না। নেমে আয়। ওটা বিপজ্জনক জায়গা।"

"শীতকালে সাপ বেরোয় না কাকা। ভয় নেই। চিন্তা করছিলেন নাকি?"

"চিন্তা করব না? সাত সকালে কোথায় বেরিয়ে গেছিস!"

"সকালে রোজ দৌড়ই। অভ্যাস। দৌড় শেষ করে ঘাটের দিকে নজর রাখতে এখানে এসে থানা গেড়েছি। এ-জায়গাটা কিন্তু ওয়াচ করার পক্ষে চমৎকার জায়গা।"

বলতে বলতে রকি নেমে এল। কালীপ্রসাদ জিজ্ঞেস করলেন, "কিন্তু সন্দেহজনক দেখলি নাকি?"

"না। গাঁয়ের লোকই আসছে-যাচ্ছে। ডেল্টার লোক বলে কাউকে মনে হল না।"

"তা বলে ডেল্টা বসে নেই। আজ হোক কাল হোক তারা হানা দেবেই।"

"ডেল্টা সম্পর্কে আপনি এত জানলেন কী করে কাকা?"

"তোর বাবার কাছ থেকেই সব শুনেছিলাম একসময়ে। আমার কাছে বাবু তো কিছুই গোপন করত না।"

রকি চিন্তিত মুখে বলে, "আমেরিকায় থাকতে আমিও অনেক কিছু। শুনেছি।"

“কী শুনেছিস?”

“পল নামে একটা লোক গোটা অগানাইজেশনকে চালায়। লোকটা ভয়ঙ্কর অহঙ্কারী, নিষ্ঠুর, আত্মকেন্দ্রিক আর প্রতিহিংসাপরায়ণ।”

“সে তো হাড়ে-হাড়ে টের পাচ্ছি।”

“আমেরিকার বিখ্যাত একটা খবরের কাগজে পল সম্পর্কে একটা বিরাট লেখা বেরিয়েছিল। তাতে একটা কথা ছিল। ডেল্টা অগানাইজেশন হিসেবে খুব পাওয়ারফুল বটে, কিন্তু সেটাকে চালায় একটাই লোক। মুশকিল হল, সেই লোকটা না থাকলে গোটা অর্গানাইজেশন ভেঙে ছয়-ছত্রখান হয়ে যাবে। কিন্তু পল এতই আত্মকেন্দ্রিক যে, ডেল্টার নেতৃত্ব আর কাউকে দেবে না। যাকে সেকেন্ড ইন কম্যান্ড বলে, পলের সেরকমও কেউ নেই।”

“বটে! তা হলে পল মরলেই সব ফরসা?”

“তাই অবস্থা ছিল। কিন্তু পল সম্প্রতি ব্যাপারটা নিয়ে ভেবেছে এবং নিজের পুরনো সিদ্ধান্ত পালটে অর্গানাইজেশনটাকে ডিসেন্ট্রালাইজড বা বিকেন্দ্রীকরণের চেষ্টা করছে! ফলে দলে প্রাধান্য এবং পদ পাওয়ার জন্য কিছু গণ্ডগোল শুরু হয়ে যায়। দু-চারটে খুন-জখমও হয় দলের মধ্যে। একটা গোষ্ঠী বেরিয়ে গিয়ে পালটা অর্গানাইজেশন করে। তবে যতদূর পড়েছি, ডেল্টা সেইসব গণ্ডগোল কাটিয়ে উঠেছে।”

কালীপ্রসাদ সতর্ক গলায় বললেন, “পলের ছেলেপুলে নেই বুঝি?”

“ছিল একটা ছেলে। কিন্তু মেক্সিকো না কোথায় যেন পলেরই বিশ্বস্ত এক অনুচর তাকে এক পার্টির মধ্যে খুন করে পালিয়ে যায়।”

অনুচরটি কে, তা কালীপ্রসাদ জানেন। কিন্তু রকি বোধ হয় জানে না। কাগজে অত কথা নিশ্চয়ই লেখেনি। ভয় আর প্রশ্ন না করে কালীপ্রসাদ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর বললেন, "বাড়ি চল।"

রকি আনমনে নদীর দিকে চেয়ে ছিল। হঠাৎ সচকিত হয়ে বলল, "দাঁড়ান! একটা নৌকো বা ভটভটি আসছে। এটাকে একটু দেখে নিই।"

রকি দক্ষ হাতে-পায়ে পাণ্ডুরাজার ঢিবির ওপর চোখের পলকে উঠে গিয়ে ঝোঁপঝাড়ে অদৃশ্য হল। কালী প্রসাদ একটু আড়ালে সরে দাঁড়ালেন।

একটু বাদে রকির চাপা স্বর পাওয়া গেল, "কালীকাকা, ভটভটি করে পনেরো-বিশজন লোক আসছে। সঙ্গে মুভি ক্যামেরা এবং আরও সব সরঞ্জাম। মনে হচ্ছে সিনেমার শুটিং করতে আসছে। উঠে আসুন না, দেখবেন।"

কালীপ্রসাদ একটু কষ্ট করেই খাড়া ঢিবিটার ওপর উঠে এলেন। রকি বাইনোকুলারটা এগিয়ে দিল। খুবই শক্তিশালী আধুনিক জিনিস। অন্তত মাইলটাক উজানে ভটভটিটাকে দেখা গেল। সত্যিই অনেক লোক এবং সরঞ্জাম। কালীপ্রসাদ অস্ফুট স্বরে বললেন, "মনে হচ্ছে এরাই। শুটিং নয় রে বাবা, ওটা ওদের মুখোশ।"

কালীপ্রসাদ তাড়াতাড়ি নেমে এসে বুড়ো নিতাই মাঝির ঝোঁপড়ার দজ্জায় গিয়ে দাঁড়ালেন।

"মাঝি, আছ নাকি?"

"আছি কর্তা। বলুন।"

"সিনেমাওলাদের আসার কথা আছে নাকি এ-গাঁয়ে?"

"আজ্ঞে না।"

"একটা ভটভটি আসছে। তাতে মেলা লোক। কোথায় আসছে বলতে পারো?"

"কত তোক তো কত দিকে যায়।"

ভটভটিটার জন্য কালীপ্রসাদ অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলেন গা-ঢাকা দিয়ে। কিন্তু শেষ অবধি এল না।

রকি নেমে এসে বলল, "ওরা এর আগে আর-একটা খালে বাঁ দিকে। ঢুকে গেল।"

রকিকে নিয়ে কালীপ্রসাদ বাড়ি ফিরে এলেন। পুরনো বন্দুকটা বের করে সারা সকাল সেটাকে সাফ করলেন। ভারী ছ্যাঁচা ইস্পাতে তৈরি। আজও চমৎকার কণ্ডিশনে আছে। গুলিগুলোও বহু পুরনো। রং চটে বিবর্ণ হয়ে গেছে। মোট পঞ্চাশটার মতো কার্টরিজ রোদে দিয়ে দিলেন। ড্যাম্প ভাবটা চলে যাবে।

রকি কাণ্ড দেখে হেসে বলল, "কাকা, এ বন্দুক তুলে তাক করতে করতে ওরা অটোম্যাটিক রাইফেলে ঝাঁঝরা করে দেবে। আমাদের।"

৬. দুটি রাত প্রায় বিনিদ্র

দুটি রাত প্রায় বিনিদ্র কেটেছে বাবু মিত্তিরের। ছেলের খবর যাওবা পেলেন, কপালের দোষে সেই ছেলেও পড়ে গেল ডেল্টার খপ্পরে। বারবার ট্রাঙ্ককল করছেন আমেদাবাদে। রকির অফিস থেকে জানাচ্ছে, তারা কোনও খবর জানে না। রকি কিছু না জানিয়েই নিরুদ্দেশ হয়েছে। এর অর্থ একটাই হতে পারে। রকি এখন ডেল্টার খপ্পরে। হয় মেরে ফেলেছে, না হলে গুম করেছে। হয়তো মুক্তিপণ হিসেবে ডলার ফেরত চাইবে। ডলার ফেরত দিলেও শেষ অবধি যে রকিকে তারা জ্যান্ত ছাড়বে না তা বাবুর চেয়ে ভাল আর কে জানে!

পরশুই তিনি আমেদাবাদ রওনা হতে চেয়েছিলেন। পলাশ বাধা দিয়ে বলেছে, "ওটা আপনার অচেনা শহর, কোথায় খুঁজবেন তাকে? তা ছাড়া কিডন্যাপ করলেও তারা নিশ্চয়ই আটঘাট বেঁধেই করেছে। আপনি শুধু-শুধু হয়রান হবেন কেন? বরং মাথা ঠাণ্ডা রেখে চিন্তা করুন।"

আজ সকালে আমেদাবাদে আবার টেলিফোন করে একটা সুখবর পেলেন বাবু মিত্তির। রকি নাকি তার অফিসের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করেছিল কাল। কোথায় আছে বা গেছে তা বলেনি। শুধু বলেছে, সে কিছুদিন ছুটি চায়। এটা সুখবর বটে, কিন্তু দুশ্চিন্তাও আছে। রকি যদি কলকাতায় তাঁর কাছেই আসবার জন্য রওনা হয়ে থাকে তা হলে কী হবে? আজ সকাল থেকে এই দুশ্চিন্তায় তাঁর বুক কাঁপছে, গলা শুকিয়ে আসছে। মড়ার মতো পড়ে আছেন বসবার ঘরের ইজিচেয়ারে।

পলাশ ঘরে ঢুকে তাঁর হাতে এক টুকরো কাগজ দিয়ে বলল, "কাকাবাবু, আপনার পায়রা এসেছে।"

বাবু মিত্তির চমকে উঠে বললেন, "পায়রা! তুমি পায়রার কথা জানলে কীভাবে?"

পলাশ ম্লান একটু হেসে বলে, "আপনি আমাকে যে পুরোপুরি বিশ্বাস করেন না তা আমি জানি। আপনার মতো অবস্থায় আমিও করতাম না। তবে আমি তো চারদিকে নজর রাখি। তাই পায়রার কথা জানতে অসুবিধে হয়নি।"

বাবু মিত্তির চিরকুটটা পড়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "কালী আমাকে বাঁচাতে চাইছে। কিন্তু আমার মৃত্যুটা আমার কাছে গৌণ হয়ে গেছে। আমার ছেলেটাকে যদি বাঁচিয়ে রাখতে পারি তবে সেটাই হবে আমার বেঁচে থাকা। এখন ভয় হচ্ছে, রকি না আমার কাছে চলে আসে!"

পলাশ ভ্রূ কুঁচকে বলে, “রকি আপনার কাছে আসবে বলে আমার মনে হয় না। ডেল্টার বিপদ সম্পর্কে কেউ তাকে অ্যালার্ট করেছে। আর সেজন্যই সে একচুলের জন্য বেঁচে গেছে। রকি পালিয়েছে।”

“কী করে বুঝলে?”

“না পালালে সে গতকাল অফিসে ফোন করত না। আর আগে থেকে খবর না পেলে সে পালাতও না। আপনার মাথা এখন ভালভাবে কাজ করছে না। করলে এই সহজ ইকুয়েশনটা আপনিই কষতে পারতেন।“

“রকি তা হলে কোথায় যেতে পারে?”

“রকির চিঠিটা ভাল করে আবার পড়ুন, তা হলেই বুঝতে পারবেন।”

“তুমি বুঝতে পেরেছ?”

“বোধ হয় আন্দাজ করতে পারছি। রকিকে আগে থেকে অ্যালার্ট করেছেন সম্ভবত আপনার বন্ধু কালীপ্রসাদ। এবং খুব সম্ভব রকি এখন কালীপ্রসাদের আশ্রয়েই আছে।”

বাবু মিত্তিরের কথাটা বিশ্বাস হল না। তবু আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, “তুমি বুদ্ধিমান, একথা তো আগেই বলেছি। আবার কি বলতে হবে?”

“না। অনেকবার বলেছেন।”

“কালীপ্রসাদ তার কাছে যেতে লিখেছে। গেলে হয়তো রকির সঙ্গে আমার দেখাও হবে। কিন্তু যাওয়া কি উচিত?”

“খুবই উচিত। কারণ রকির চিঠি ডেল্টাও পড়েছে। তারা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধিমান। রকি যে কালীপ্রসাদের কাছেই যাবে এটা বুঝতে তাদের দেরি হবে না।”

"সর্বনাশ! তা হলে তো আমার এখনই সেখানে যাওয়া উচিত!"

পলাশ একটু হেসে বলল, "যাওয়া উচিত তো ঠিকই। কিন্তু আপনি এখন আর সেই আগেকার অলিম্পিক বক্সার নেই। গায়ের জোরে রকিকে বাঁচাতেও পারবেন না। আর আমার মনে হয় কালীপ্রসাদ অত্যন্ত বুদ্ধিমান লোক। যদি পারেন তা হলে তিনিই হয়তো পারবেন রকিকে বাঁচাতে।"

একটু দোনোমোনো করে বাবু মিত্তির বললেন, "তুমি কি আমার সঙ্গে যাবে?"

"আপনি কি আমাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করেন?"

বাবু মিত্তির একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "বিশ্বাস না করেও কোনও লাভ নেই। তুমি যদি ডেল্টার লোকও হয়ে থাকো তবু তুমি তো সবই জানো।"

"এবার ঠিক কথাই বলেছেন। আপনি জিনিসপত্র গুছিয়ে নিন। কালীপুরে যেতে হলে তাড়াতাড়ি রওনা হওয়া ভাল। আপনার

অনুপস্থিতিতে রাখাল বাড়ি আগলে থাকতে পারবে।"

ঘণ্টাখানেকের বেশি সময় লাগল না। বাবু মিত্তির পলাশকে নিয়ে কালীপুর রওনা হয়ে গেলেন। প্রকাশ্যে বেরিয়ে পড়তে আর কোনও চিন্তা ছিল না বাবু মিত্তিরের। প্রথমত, তেজস্ক্রিয় শলাকা বিছানায় রেখে ডেল্টা ধরেই নিয়েছে যে, অচিরেই বাবুর ক্যানসার হবে। ডেল্টা তিল তিল করে মারতে চাইছে। ফন্দিটা যে খাটেনি তা ডেল্টা এখনও জানে না। বাবু বিছানা পরিপাটি করে পেতে চাঁদরের নীচে অবিকল আর-একটা ছুঁচ রেখে এসেছেন। ডেল্টা সরেজমিনে তদন্তে এলেও ক্ষতি নেই, যদি না তারা তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষার জন্য গাইগার কাউন্টার যন্ত্র আনে। দ্বিতীয়ত, আপাতত তারা বাবুকে না মেরে প্রথমে মারতে চাইবে রকিকে। সুতরাং বাবুর এখন ভয় নেই। ৬৮

পথে কোনও ঘটনাই ঘটল না, শুধু একজন বুড়ো বাউল কামরায় সবাইকে ছেড়ে বাবু মিত্তিরের সামনে এসে একটু নেচে নেচে যখন গাইছিল, "পিঁজরার পাখি রে ডাকিছে গগন, ছাড়িয়া দাও তারে এইবারে ..." তখন বাবু মিত্তির চাপা গলায় বলে উঠলেন, "ডেল্টা!"

পলাশ বলল, "ডেল্টা কি এভাবে নিজেকে এক্সপোজ করবে?"

"তা বটে।" বাউলটা মাঝপথে নেমে গেল। বাকি পথটায় আর কোনও ঘটনা ঘটল না। যখন কালীপুরের ঘাটে এসে নামলেন তখন বিকেল হয়-হয়। প্রায় এক যুগ পরে রকির সঙ্গে দেখা হবে ভেবে বাবু মিত্তিরের বুকটা আনন্দে এত ধড়ফড় করছিল যে, ভাল করে শ্বাস নিতে পারছিলেন না। শরীরটা যেন বেহাল। আবার মনে হচ্ছে, রকির এখানে থাকা কি সম্ভবপর? এতই সহজ হবে কি ব্যাপারটা?

সুন্দরবনে গাড়িঘোড়া, রিকশা কিছুই নেই। নৌকো আর হাঁটাপথ। কিছু-কিছু জায়গায় রিকশা-ভ্যান চলে। কালীপুরে তাও নেই। অনেকটা হাঁটতে হল। কিন্তু হাঁটাটা বাবু মিত্তিরের পক্ষে মঙ্গলজনকই হল। বুকের ধড়ফড়ানি কমে গিয়ে স্বাভাবিক বোধ করতে লাগলেন।

কালীপ্রসাদের বাড়ির ফটকে ঢুকতে যেতেই কোথা থেকে একটা মুশকো লোক ইয়া বড় এক মুগুর হাতে সামনে উদয় হল। চোখে কটমটে দৃষ্টি। ঢুকতে দেবে না। বাবু মিত্তির খুঁসি বাগিয়ে ফেলেছিলেন, কিন্তু পলাশ বাধা দিয়ে বলল, "এ তো কালীপ্রসাদেরই লোক হতে পারে। দাঁড়ান দেখছি কথা বলে।"

কিন্তু বিপদ হল, লোকটা বোবা। কথা বলতে পারে না, কিন্তু কটমটে চোখ দুটোই ওর কথা। বলতে চাইছে, কেটে পড়ো।

বাবু মিত্তির একটু রাগের গলায় বললেন, "ওহে পলাশ, চৌকাঠই যে ডিঙোতে পারছি না। আমি বরং একে আস্তে করে একটা আপারকাট মেরে দিই, নইলে ঢুকতে দেবে না।"

পলাশ বাধা দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু বাবু মিত্তিরের তর সইল না। রকির সঙ্গে দেখা হবে, তিনি কাঁহাতক ধৈর্য রাখতে পারেন। তিনি সোজা এগিয়ে গিয়ে তাঁর বহু-বিখ্যাত খুঁসির একটি চালিয়ে দিলেন।

আশ্চর্যের বিষয়, এখনও বাবু মিত্তিরের খুঁসির বহর দেখবার মতো। বিরাট চেহারার লোকটা ঘুসি খেয়ে প্রায় শূন্যে উঠে ছিটকে পড়ল মাটিতে। বাবু মিত্তির হাত দুটো নেড়ে বললেন, "দেখলে?"

"দেখলাম!" কথাটা যে বলল সে পলাশ নয়। অন্য একজন। ফটকের পাশ থেকে ছিপছিপে চেহারার একটি দীর্ঘকায় যুবক বেরিয়ে এল সর্পিল গতিতে। কেউ কিছু বুঝে উঠবার আগেই সে সামনে পলাশের চোয়ালে একটা বিদ্যুৎগতির ঘুসি মারল। পলাশ ধানুর মতোই খানিকটা শূন্যে বিচরণ করে ছিটকে পড়ে গেল এবং পড়েই রইল। ছোঁকরার দ্বিতীয় খুঁসিটা অবশ্যম্ভাবী বাবু মিত্তিরের মাথা লক্ষ্য করে সাপের ছোবলের মতোই এল। বাবু মিত্তির অভ্যস্ত সাইড স্টেপ করে সরে গিয়েই বাঁ হাতে বিষাক্ত একখানা জ্যাব করলেন। তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারলেন, ডেল্টা তার জন্য এখানেই অপেক্ষা করছিল। ডেল্টার ওপর তার সুগভীর রাগ। সামনে যাকে পান তাকেই খুন করেন। এটাও বুঝতে পারছেন, পুরো ব্যাপারটাই একটা চক্রান্ত। রকির চিঠি, পলাশের ব্যাখ্যা, এখানে তাঁকে নিয়ে আসা, সবই যেন চক্রান্তের একটা অংশ।

তাঁর জ্যাবটা ছেলেটা হাতেই ব্লক করে দিল। তারপর ডান হাতে চমৎকার একটা নক-আউট পাঞ্চ করল বাবুর চোয়ালে। কিন্তু বাবু মুখটা সরিয়ে ঘুসিটাকে বাতাসে ভাসিয়ে দিয়ে ব্যাক স্টেপ করে সরে এলেন। বহুকাল পরে উপযুক্ত প্রতিপক্ষ পেয়েই যেন বাবু মিত্তিরের রক্ত টগবগ করে ফুটতে লাগল। শিরায়-শিরায় গরম রক্ত পাগলা ঘোড়ার মতো ছুটছে। বাবু মিত্তির তার প্রতিপক্ষের বয়স ও ক্ষিপ্রতাকে উপেক্ষা করেই দ্রুত দুই পা এগিয়ে ডান হাতে একটা ভূয়ো ঘুসি মেরে ছেলেটার ভারসাম্যে গোলমাল ঘটিয়ে বাঁ হাতে আসল খুঁসিটা মারলেন। কিন্তু ছেলেটা ভালই শিখেছে। দু হাতে ব্লক করে খুঁসিটা আটকে

দিয়ে মাথাটা নিচু করে বাঁ হাতটা উঁচুতে তুলে চমৎকার পায়ের কাজ দেখিয়ে এগিয়ে এসে পর-পর অতি দ্রুত তিনটে ঘুসি মারল বাবুকে। বাবু মনে-মনে তারিফ করলেন আর তিনটে মোচড়ে শরীরকে তিনদিকে তিনবারে হেলিয়ে ঘুসিগুলোকে কাটিয়ে দিলেন। কিন্তু অবাক হয়ে দেখলেন, ছেলেটার বাঁ হাতটা সাপের ছোবলের মতো উঁচু করে রাখাটা অবিকল তাঁরই মতো। আর সেইজন্যই তাঁর নাম হয়ে গিয়েছিল কোব্রা। তাঁরও বাঁ হাত সামান্য ওপরে ভোলা থাকত আর সেটা গোখরোর ফণার মতো দোল খেত।

বাবু অস্ফুট গলায় বললেন, "কাম অন ডেল্টা!"

ছেলেটাও. অস্ফুট স্বরে বলে উঠল, "আই শ্যাল ডিল উইথ ইউ ডেল্টা।"

কেউই কারও কথা শুনতে পেল না। বাবু মিত্তির পর-পর চারটে ঘুসি মারলেন। চারটেই কেটে গেল। ছোো মারল পাঁচটা। বাবু মিত্তির পাঁচটাই কাটালেন।

হারজিত হচ্ছে না। দুজনেই দক্ষ, সতর্ক। একজনের সঙ্গে অন্যজনের তফাত শুধু বয়স ও তৎপরতায়, অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানে। বাবু মিত্তির ছেলেটাকে একটু সময় দিলেন, তারপর হাত দুটো নামিয়ে প্রলুব্ধ করলেন ঘুসি মারতে। ছেলেটা সেই ফাঁদে পা দিল না। অপেক্ষা করল। তারপর চমৎকার দ্রুত সাবলীল গতিতে এগিয়ে এসে বাবুর ব্লকের ফাঁক দিয়ে দারুণ তৎপরতায় একটা খুঁসি চালিয়ে দিল। খুঁসিটা পুরোপুরি এড়াতে পারলেন না বাবু। মাথা স্পর্শ করে ঘষটে গেল। বাবু তলা থেকে হাতটা ওপরে তুলে পালটা একটা শর্ট পাঞ্চ করলেন। ছেলেটার বাঁ চোয়ালে সেটা লাগল, তবে জোরে নয়।

হঠাৎ কাছ থেকে কে যেন বলে উঠল, "এ কি সোরাব-রুস্তম হচ্ছে নাকি? ওরে রকি, থাম! ও তোর বাবা।"

রকি থামল। বাবু বেকুবের মতো চেয়ে রইলেন। সামনে কালীপ্রসাদ।

কালীপ্রসাদ ক্ষুব্ধ গলায় বললেন, "তোরা কচ্ছিসটা কী? আর এ-দুটোই বা এ-অবস্থায় পড়ে আছে কেন?"

বাবুর কানে কোনও কথাই ঢুকছে না। তিনি হাঁ করে ছেলেটাকে দেখছেন। এই কি তাঁর ছেলে রকি?

রকিরও বাহ্যজ্ঞান নেই। সেও চেয়ে আছে বাবার দিকে। এই কি তার বাবা বাবু মিত্তির?

কয়েক সেকেন্ডের বিহ্বলতার পরই দুজন দুজনকে জাপটে ধরল। "রকি! "

"বাবা!"

পলাশ উঠে বসে চোয়াল ঘষতে-ঘষতে দৃশ্যটা দেখে বলে উঠল, "দু'জনেই গুণ্ডা।"

কিছুক্ষণ বাদে খাওয়ার টেবিলে বসে রকির দিকে চেয়ে বাবু বললেন, "তুই বক্সিং কোথায় শিখলি?"

রকি খুব লজ্জা-লজ্জা মুখে বলল, "আমেরিকায়। ফ্লয়েড প্যাটারসনের কাছে।"

"বলিস কী! প্যাটারসন তোকে শিখিয়েছে? তাই অত ভাল শিখেছিস! যা শিখেছিস অলিম্পিকে স্বচ্ছন্দে যেতে পারিস।"

রকি মাথা নেড়ে বলে, "না বাবা। বক্সিং আমার জান-প্রাণ নয়। তুমি আমাকে জোরজবরদস্তি বক্সার বানাতে চেয়েছিলে। আমার তাতে কষ্ট হত। আমি শিখেছি শখ করে। প্যাটারসনও বলতেন, আমি ন্যাচারাল বক্সার। কিন্তু প্রফেশন্যাল নই। আমি বক্সিংয়ের চেয়ে লেখাপড়া বেশি পছন্দ করতাম।"

"তোকে বক্সার হতে বলছি না। কিন্তু গুণটা নষ্ট করলি। তুই তো বোধ হয় হেভিওয়েট নোস, তাই না?"

“না বাবা, আমি লাইট হেভিওয়েট। তোমারই ক্যাটেগরি।” বাবু মিত্তিরের মুখটা খুবই উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। পুত্রগর্বে গৌরব বোধ করছিলেন।

পলাশ টেবিলের অন্য ধার থেকে বলল, “রকিবাবু, আপনার খুঁসি খেয়ে পেট ভরে গেছে, খেতে পারছি না।”

রকি লজ্জিত হয়ে বলে, “আমি ফটক পাহারা দিচ্ছিলাম। বাবা ধানুকে অ্যাটাক করায় আমার মনে হয়েছিল, আপনারাই ডেল্টার লোক।

তবে আসলে ডেল্টার লোকও বোধ হয় ধারেকাছেই আছে। আজ সকালে তারা সিনেমার শুটিং করার অছিলায় এসেছে। আমরা খোঁজ নিয়েছি কাছাকাছি কোথাও শুটিং হচ্ছে না।”

বাবু মিত্তির বললেন, “সর্বনাশ! তা হলে কী হবে?”

কালীপ্রসাদ বললেন, “যা হওয়ার হবে। আমরা একসঙ্গে আছি, ভয় কিসের?”

গল্পেগুজবে, আড্ডায় সন্ধেটা চমৎকার কেটে গেল সকলের। বাবু মিত্তির আসন্ন বিপদ সত্ত্বেও বেশ ঝরঝরে বোধ করতে লাগলেন। অসুস্থতাটা যেন বারোআনাই কেটে গেছে।

ক্রমে রাত হল। খাওয়ার পর কালী প্রসাদ বললেন, “তোমরা সব শুয়ে পড়ো। আমি জেগে থাকব।”

বাবু, রকি, পলাশ সবাই একসঙ্গে বলে উঠল, “আমরা শুচ্ছি না। রাত জেগে পাহারা দেব।”

যোগেন আর ধানুও শুতে রাজি হল না। কালীপ্রসাদ অগত্যা প্রস্তাবটা মেনে নিয়ে বললেন, “গাঁয়ের কয়েকটা ছেলেকে আমি নানা জায়গায় পাহারা রেখেছি। তোমরাও কেউ এক জায়গায় থেকো না। বাড়ির বিভিন্ন ঘর থেকে চারদিকে নজর রাখো।”

দোতলায় চারটে কোণে চারটে শোওয়ার ঘর। বাবু, রকি, পলাশ আর যোগেনকে চারটে ঘরে মোতায়েন করলেন কালী প্রসাদ। ধানু রইল নীচে আর-একটা ঘরে। ল্যাবরেটরিতে কালীপ্রসাদ। হাতে বন্দুক। কিন্তু নরহত্যা করার ইচ্ছে তাঁর মোটেই নেই। আত্মরক্ষার জন্য করতে হলে করবেন, কিন্তু সেটা খুব অপারগ না হলে নয়।

রাত দশটা বাজল। ধীরে-ধীরে এগারোটা। বারোটা। কিছুই ঘটছিল না। কালীপ্রসাদ দক্ষিণের জানালাটা একটু ফাঁক করে চোখ রেখে বসে আছেন। ঘর অন্ধকার। চোখে অন্ধকার সয়ে গেছে কালীপ্রসাদের।

হঠাৎ কোকিলের ডাকের মতো একটা শিস শুনতে পেলেন। এ হচ্ছে মালোপাড়ার যতীন। জানান দিচ্ছে, গাঁয়ে কেউ ঢুকেছে।

একটু বাদে টিটি পাখির মতো আর-একটা শিস। আমতলায় বিমল মোতায়েন আছে। সঙ্কেত দিচ্ছে, এ বাড়ির দিকে কেউ বা কারা আসছে।

কালীপ্রসাদ একটু মৃদু কাশলেন, ওপর থেকে পালটা একটু কাশির শব্দ শোনা গেল। অর্থাৎ, বাবু সতর্ক আছে।

আরও প্রায় দশ মিনিট নিথরভাবে বসে থাকার পর হঠাৎ কালীপ্রসাদের চোখে পড়ল, একটা ছায়ামূর্তি একটা কামিনী ঝোঁপের আড়াল থেকে আর-একটা ঝোঁপের আড়ালে সরে গেল।

কানের কাছে হঠাৎ একটা মশা চক্কর দিচ্ছে আর পনপন আওয়াজ করছে। কালী প্রসাদ থাবড়া মারতে হাত তুলেও থেমে গেলেন। মশাটা এবার যেন তাঁর কানের গর্তের মধ্যে ঢুকে গিয়ে পিনপিন করে কথা বলতে লাগল।

কালীপ্রসাদ স্থির হয়ে মশার শব্দটা মন দিয়ে শুনতে লাগলেন। মশাটা গুনগুন করে বলল, “নিজেকে খুব বুদ্ধিমান ভাবো নাকি?”

"আজ্ঞে না।"

খুব বিনীতভাবে বললেন কালী প্রসাদ।

"তোমার শত্রুপক্ষ খুবই শক্তিমান। ইচ্ছে করলেই তারা তোমাদের সুদ্ধু গোটা বাড়িটাই উড়িয়ে দিতে পারে।"

"যে আজ্ঞে।"

"তোমাদের কাছে যথেষ্ট অস্ত্রশস্ত্র নেই, লোকবল নেই, প্রবল শত্রুর সঙ্গে পারবে কী করে?"

"আমাকে পরামর্শ দিন।"

"তুমি যে বন্ধু এবং আশ্রিতজনদের বাঁচানোর জন্য নিজের বিপদ তুচ্ছ জ্ঞান করছ এতে আমরা-তোমার পূর্বপুরুষেরা সন্তুষ্ট। শত্রুদের লক্ষ্য দু'জন। বাবু মিত্তির আর তার ছেলে। ছেলেটাকে মারতেই তারা এসেছে। বাবু মিত্তিরকে তারা মারবে না, দগ্ধে-দগ্ধে মরতে দেবে বুঝেছ?"

"যে আজ্ঞে। "

"সুতরাং সকলের মঙ্গলের জন্য তোমার উচিত হবে ছেলেটাকে শত্রুপক্ষের হাতে ছেড়ে দেওয়া।"

কালী প্রসাদ শিহরিত হয়ে বললেন, "সে কী! তা হলে তো চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে।"

মশা যে হাসতে পারে তা জানা ছিল না কালীপ্রসাদের। শুধু হাসি নয়, অট্টহাসি। কালীপ্রসাদ নিজের কানের মধ্যে সেই আশ্চর্য অট্টহাসি শুনতে পেলেন। মশা বলল,

“শোনো কালীপ্রসাদ, নিজের বুদ্ধিতে যদি চলো তা হলে আমার পরামর্শের প্রয়োজন তোমার নেই। সেক্ষেত্রে তোমাদের ভাগ্যে যা আছে তাই হবে।”

“আজ্ঞে, আমাকে একটু বুঝিয়ে বলুন।”

“শত্রুপক্ষের সর্দারের নাম পল। সে নিজে এসেছে। ঢ্যাঙা এবং শীর্ণ চেহারার একটি লোক। সে অত্যন্ত প্রতিহিংসাপরায়ণ। বহুদিন ধরে সে প্রতিশোধের জন্য অপেক্ষা করছে। আজ সে নিজের হাতে বাবু মিত্তিরের ছেলেকে মারবে। নইলে তার বুকের জ্বালা জুড়োবে না।”

কালীপ্রসাদ অবাক হয়ে বললেন, “পল নিজে এসেছে?”

“হ্যাঁ। তুমি সদর দরজাটা খুলে দাও। ওদের আসতে দাও। তার আগে বাবু মিত্তিরের কাছে গিয়ে তার পিস্তলটা চেয়ে নাও কারণ সে গুলি ছুঁড়লে সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে।”

এ কাজ করলে বাবু যে আমাকে আর বিশ্বাস করবে না। আমি বিশ্বাসঘাতকতার দায়ে পড়ে যাব।”

“তা হলে নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা অনুযায়ী চলো। আমাদের আর কিছু করার নেই।”

কালীপ্রসাদ তাড়াতাড়ি বললেন, “আজ্ঞে, আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি আপনার পরামর্শই মেনে নিচ্ছি।”

“তা হলে তাড়াতাড়ি করো। সদর দরজাটা অত্যন্ত দুর্লভ কাঠ দিয়ে তৈরি। ও কাঠ আর পাওয়া যায় না। শত্রুরা দরজাটা ভাঙার আগেই ওটা খুলে দিতে হবে। বুঝেছ?”

“যে আজ্ঞে।”

কালীপ্রসাদ বিষণ্ণ মনে ধীরে ধীরে দোতলায় উঠে বাবু মিত্তিরের ঘরে এলেন।

"বাবু।"

বাবু মিত্তির জানালার ধারে পিস্তল হাতে নিয়ে বসে ছিলেন। ডাক শুনে চমকে ফিরে তাকালেন, "কী রে?"

"তোর পিস্তলটা আমাকে দে।"

"কেন?"

"দে না।"

বাবু মিত্তির সন্দিহান চোখে বন্ধুর দিকে কয়েক পলক চেয়ে রইলেন অন্ধকারে। তারপর দ্বিধাজড়িত হতে পিস্তলটা এগিয়ে দিয়ে বললেন, "কিছু দেখেছিস?"

কালীপ্রসাদ সত্যি কথাটাই বলবার জন্য হাঁ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর হয়ে আর- একটি কণ্ঠ বলে উঠল, "না, কিছু দেখিনি। তুই দেখেছিস?"

বাবু বললেন, "না। কিন্তু পাখির ডাক শুনছি। রাতে পাখি ডাকে নাকি?"

অন্য কণ্ঠটি কালীপ্রসাদের হয়ে বলল, "তা ডাকে। ভয়ের কিছু নেই। এখনও।"

"পিস্তলটা নিচ্ছিস কেন?"

অন্য কণ্ঠটি বলল, "তোর ভালর জন্যই। এখন তোর মাথা ভাল কাজ করছে না। দুম করে চালিয়ে দিলে বিপদ হতে পারে।"

"তা বটে। বুড়ো বয়সে খুনটুন করার ইচ্ছেও আমার ছিল না। কিন্তু ছেলেটাকে বাঁচাতে তো কিছু করতেই হবে।"

অন্য কণ্ঠটি বলে উঠল, "বিপদে মাথা ঠিক রাখতে হয়।"

কালীপ্রসাদ চমৎকৃত হচ্ছিলেন। হুবহু তাঁর গলা নকল করে কে কথাগুলো বলে দিচ্ছে? তিনি কণ্টকিত শরীরে নীচে এলেন। তারপর সাবধানে সদর দরজার খিল খুলে দরজাটা হাট করে দিলেন। তারপর ল্যাবরেটরিতে এসে জানালার কাছে বসে রইলেন।

প্রথমে অনেকক্ষণ কিছুই ঘটল না। বাগানে নড়াচড়া নেই। কানেও মশার শব্দ নেই। কালীপ্রসাদ শুধু চেয়ে রইলেন।

হঠাৎ ওপর থেকে বাবু মিত্তিরের চিৎকার শোনা গেল, "সাবধান! ওরা আসছে!"

বাবু বোধ হয় দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে দুড়দাড় নামতে লাগল। কালীপ্রসাদ আরও তিনজোড়া পায়ের শব্দ পেলেন। সবাই ছুটে আসছে নীচে।

কানে মশাটা বলে উঠল, "হুঁড়োহুড়ি কোরো না। যা ঘটছে ঘটতে দাও।"

কালীপ্রসাদ বললেন, "যে আজ্ঞে।"

বলে উঠে দরজায় এসে দাঁড়ালেন। সামনেই দরদালান। ডান দিকে সদর দরজা। দেখলেন সদর দরজা দিয়ে কয়েকটা ছায়ামূর্তি চটপটে পায়ে ভিতরে ঢুকে সিঁড়িটা আগলে দাঁড়াল।

বাবু সবার আগে নেমে আসছিলেন। অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা তাঁর লোপ পেয়েছে। তিনি চার সিঁড়ি ওপর থেকে ঘুসি বাগিয়ে লোকগুলোর ওপর লাফিয়ে পড়লেন, "তবে রে! আজ সবাইকে শেষ করে ছাড়ব।"

শুধু বাবু নয়, পিছনে রকি, পলাশ, যোগেন। বাবু আর রকি দক্ষ বক্সার। তারা দুমদাম খুঁসি চালিয়ে যেতে লাগল। ছায়ামূর্তিরা একটু বেসামাল হয়ে পড়ল আচমকা আক্রমণে। দু'জন, ঘুসি খেয়ে পড়েও গেল ছিটকে। কিন্তু তারপরেই লোকগুলো ছোট-ছোট ব্যাটনের মতো জিনিস দিয়ে পালটা মারল।

মিনিটখানেকের মধ্যেই লড়াই শেষ হয়ে গেল। সিঁড়িতে আর দরদালানের মেঝেয় চারজনই ভূমিশয্যা নিয়েছে।

লম্বা সুরুঙ্গে চেহারার একটা লোক ভিতরে এসে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা দেখে ঠাণ্ডা গলায় ইংরেজিতে বলল, "ওদের বেঁধে ফেল।"

চটপট বাঁধা হল চারজনের হাত আর পা। লম্বা লোকটা বলল, "চোখেমুখে জল দাও। জ্ঞান ফিরে আসুক।" তাই করা হল। বাবু মিত্তির একটু কাতর শব্দ করে উঠে বসলেন। তারপর সামনে চেয়ে লম্বা লোকটাকে দেখে ভীষণ চমকে উঠে বললেন, "পল!"

"চিনতে পারছ তা হলে? বিশ্বাসঘাতক!" বাবু মিত্তির ডুকরে উঠে বললেন, "বিশ্বাস করো পল, আমি রাউলকে মারিনি। রাউল আমার বন্ধু ছিল। রাউলকে মেরেছিল সিকিউরিটির লোরো।"

"তোমার সাফাই আমার জানা ছিল। পুত্রশোক কিরকম হয় তা জানো? এত বছর ধরে আমি ভিতরে-ভিতরে জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছি। তোমাকে সেই জ্বালার একটু ভাগ দিতে চাই।"

"দোহাই পল, একাজ কোরো না। কী প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে বলল। ডলার ফেরত চাও, দেব। সব কিছু করব। শুধু আমার ছেলেটাকে ছেড়ে দাও।"

"রাউল তোমার বন্ধু ছিল, তোমার জন্য সে অনেক কিছু করেছিল। প্রতিদানে তার জুটেছিল কয়েকটা বুলেট। এ-পাপের কী প্রায়শ্চিত্ত হয়। আর যদি হয় তা ঠিক এইভাবেই হয়। পুত্রশোকের ভাগিদার হয়ে সেই প্রায়শ্চিত্তই করতে হবে তোমাকে। তারপর ধীরে ধীরে অশেষ যন্ত্রণা পেয়ে ক্যানসারে মারা যাবে তুমি। আমি এ-দিনটারই অপেক্ষায় ছিলাম।"

বাবু নিজেকে সংযত করলেন। গলা থেকে আবেদন-নিবেদনের ভাবটা মরে গেল। তেজী গলায় বললেন, "পল, আমাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে বলছ? তোমার পাপও কি কিছু কম? অলিম্পিকে সোনার পদক আমার বাঁধা ছিল। কেউ সেবার আমাকে হারাতে পারত না। তুমি রাউলকে পদক পাইয়ে দেওয়ার জন্য আমাকে ফুড পয়জ করেছিলে। বলো, করোনি? তুমি কি জানো একটা অলিম্পিকে একটা সোনার পদক আমার কাছে তখন কতখানি মূল্যবান ছিল?"

পল হাসল, "পদকের শোকের চেয়েও বড় শোক পৃথিবীতে আছে। স্বীকার করছি, আমি তোমাকে রাউলের পথ থেকে সরিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু ক্ষতিপূরণও করেছি। তোমাকে অনেক টাকা দিয়েছি।"

"এমনই দাওনি। আমাকে পাপের পঙ্কিল পথে নামিয়েছিলে।"

"দুনিয়াতে পাপ বলে কিছু নেই। ওসব দূর্বলদের কথা। যে-কোনও জীবিকাই জীবিকামাত্র।"

"তুমি পিশাচ।"

"ঠিক কথা। এখন বলো তো, তোমার ছেলের মৃত্যু আমি কীভাবে ঘটাব! পারবে বলতে?"

"আগে আমাকে মারো পল। এইটুকু দয়া করো।"

পল হাসল। বলল, "ধীরে বন্ধু, ধীরে। তাড়াহুড়োর কী আছে? দুনিয়াটাকে আর কিছুদিন ভোগ করে নাও। আমার খুব ইচ্ছে, তোমার ছেলের ডান হাতটা প্রথমে কেটে ফেলি। ও চেঁচাবে, ছটফট করবে। তুমি চেয়ে-চেয়ে দেখবে। কেমন হবে ব্যাপারটা?"

রকি একটা ঝাঁকি দিয়ে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে বলল, "আমি তোমাকে একটা কথা বলে নিতে চাই পল। আমি মরতে ভয় পাই না। বেশি নাটক না করে যা করার করে যাও।"

"অত তাড়া কিসের? গাড়ি ধরবে নাকি?" বলে পল খুব হাসল। হঠাৎ তার হাতে ঝিকিয়ে উঠল একটা এক ফুট লম্বা সরু ছুরি।

কালীপ্রসাদের হাত-পা নিসপিস করছিল। তিনি মুঠো বাগিয়ে এক পা এগিয়ে গিয়েছিলেন। কানের মধ্যে মশা পনপন করে উঠল, "করো কী! চুপ করে থাকে। নাটকটা দেখতে দাও।"

প্রায় নিঃশব্দে কালীপ্রসাদ হাসলেন,"যে আজ্ঞে।"

ছুরিটা হাতে নাচাতে-নাচাতে পল বলল, "চেয়ে দ্যাখো বাবু। দু চোখ ভরে দ্যাখো, প্রথমে তোমার ছেলের ডান হাত কেটে নিচ্ছি। তারপর বাঁ হাত। তারপর একটা চোখ উপড়ে নেব। তারপর আর-একটা। তখনও ও মরবে না। চেঁচাবে, দাপাবে। ঘণ্টাখানেক বাদে রক্তক্ষরণে মারা যাবে। দ্যাখো। "

বলে পল গিয়ে রকির সামনে দাঁড়াল।

ঠিক এই সময়ে কালীপ্রসাদ পিস্তলটা তুলতে যাচ্ছিলেন। আর সময় নেই। কিছু একটা না করলে রকি মরবে।

মশাটা কানে পনপন করে উঠে বলল, "ওকাজ কোরো না। তুমি আমাদের শেষ বংশধর। খুনটুন করে বসলে পাপ হয়ে যাবে। তা হলে নিম্নগতি হবে। আমাদের উদ্ধার করবে কে?"

"যে আজ্ঞে।"

ভক করে হঠাৎ বোঁটকা গন্ধটা নাকে এল কালী প্রসাদের। খুবই চেনা গন্ধ। গতকালও পেয়েছিলেন। গন্ধের উৎস খুব কাছেই। কালীপ্রসাদ চারদিকে তাকাতে লাগলেন। হঠাৎ চমকে উঠে দেখলেন, ঠিক তাঁর পাশে, গা ঘেঁষেই বিশাল কেঁদো বাঘটা।

পল ছুরিটা নিপুণ হাতে ধরে রকির কনুইয়ের ওপর চালাতে যাচ্ছে ঠিক এই সময়ে তার দলের লোকেরা আর্তনাদ করে উঠল, “বাঘ! বাঘ!”

পল চকিতে ঘুরে দাঁড়াল, “মাই গড! শুট ইট।”

সঙ্গে-সঙ্গে গোটা-দুই স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র ট্যারা-ট্যাট-ট্যাট করে ঝাঁঝরা করে দিচ্ছিল বাঘটাকে।

কিন্তু বাঘটা নির্বিকারভাবে দাঁড়িয়ে পথের দিকে চেয়ে ছিল। পল ছুরিটা তুলে বিদ্যুৎগতিতে ছুঁড়ল বাঘটার দিকে। কালীপ্রসাদ অবাক হয়ে দেখলেন ছুরিটা বাঘটাকে ভেদ করে দেওয়ালে গিয়ে লাগল।

তারপর যা ঘটল তা অবিশ্বাস্য। বাঘটা একটা চাপা গর্জন করে একটা ঘূর্ণিঝড়ের মতো গিয়ে পড়ল পলের ওপর। তাকে মুখে তুলে নিয়ে একটি লাফে খোলা দরজা দিয়ে বাইরে গিয়ে পড়ল।

পলের স্যাঙাতরা ছিটকে পড়ল এদিক-ওদিক। সবাই কুমড়ো-গড়াগড়ি।

মশাটা কালীপ্রসাদের কানের মধ্যে বলল, “ওদের বাঁধন খুলে দাও। পাজি লোকগুলোকে বেঁধে ফেল। ওরা এখন নিরস্ত্র।”

কালী প্রসাদ বললেন, “যে আজ্ঞে। কিন্তু বাঘটা কোথা থেকে এল?”

“ওকে চিনতে পারলে না? ও তোমার হালুম।”

"বুঝেছি।" বলে কালী প্রসাদ কৃতজ্ঞতায় চোখের জল মুছলেন। তারপর এগিয়ে গিয়ে চারজনের বাঁধন খুলতে লাগলেন।